বিসমিল্লাহির রহ-মা-নির রহীম

পরম করুনাময় ও অতিশয় দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে (শুরু)।

কামিল (স্নাতকোত্তর) তাফসীর ১ম পর্ব

৮ম পত্র : আল-আকিদাহ আল-ইসলামিয়্যাহ

বিষয় কোড: ৬২১১০৮

নির্ধারিত গ্রন্থ:

بحر الكلام : أبو المعين ميمون النسفي

- **বাহরুল কালাম:** আবুল মুঈন মাইমুন আন-নাসাফী

নির্ধারিত পাঠ: সাজেশন অংশে

▪ মানবন্টন

- **ক) বিস্তারিত প্রশ্ন:** ১০টি থাকবে ৮টির উত্তর দিতে হবে: ৮×১০=৮০
- **খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:** ৬টি থাকবে ৪টির উত্তর দিতে হবে: ৪×৫=২০

▪ সাজেশন:

١ -دراسة عن حياة العلامة ابي المعين ميمون النسفي وهي تشمل اسمه وولادته ونشأته العلمية ورحلاته أشهر شيوخه وتلاميذه ومكانته العلمية ومناقبه و أقوال العلماء فيه، ومؤلفاته، ووفاته.

১- আল্লামা আবুল মুঈন মাইমুন আন-নাসাফীর জীবনীর উপর একটি গবেষণা, যা তাঁর নাম, জন্ম, শিক্ষাজীবন, ভ্রমণ, বিখ্যাত শিক্ষক ও ছাত্র, তাঁর জ্ঞানগত মর্যাদা, গুণাবলী, বিদ্বানদের উক্তি, রচনাবলী এবং মৃত্যু অন্তর্ভুক্ত করবে।

٢ -دراسة عن كتاب بحر الكلام وهي تشمل ميزاته وخصائصه ومنهج المؤلف فيه ومنزلته بين كتب العقائد وعناية العلماء به.

২- "বাহরুল কালাম" গ্রন্থটির উপর একটি গবেষণা, যা এর বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, লেখকের পদ্ধতি, আকাইদের গ্রন্থাবলীতে এর অবস্থান এবং বিদ্বানদের এর প্রতি মনোযোগ অন্তর্ভুক্ত করবে।

٣ -دراسة عن مصطلح العقيدة : تعريفها وموضوعها وغرضها وأهميتها ومصادرها ونشأتها وتطورها وأشهر المؤلفات فيها و أبرز الشخصيات في هذا الفن.

৩- আকীদা (বিশ্বাস) পরিভাষার উপর একটি গবেষণা: এর সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, উৎস, উৎপত্তি, বিকাশ, এই বিষয়ে বিখ্যাত রচনাবলী এবং এই শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

নির্ধারিত পাঠ:

دراسة تحليلية لكتاب بحر الكلام : أبو المعين ميمون النسفي (الكتاب تماما)

- **বাহরুল কালামের একটি বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা:** আবুল মুঈন মাইমুন আন-নাসাফী (সম্পূর্ণ গ্রন্থ)।

▪ স্পেশাল সাজেশন

ক) বিস্তারিত প্রশ্নসমূহ

(١) عرف التوحيد ثم اذكر أركانه، هل صفة الله تعالى الذاتية والفعلية قديمة؟ بين

তাওহীদের সংজ্ঞা দিন, অতঃপর এর রোকনগুলো (স্তম্ভ) উল্লেখ কর। আল্লাহর যাতী (সত্তা বিষয়ক) ও ফে'লী (কর্ম বিষয়ক) সিফাত কি কাদীম (অনাদি)? বর্ণনা কর।

(٢) هل يجوز إطلاق لفظ "الشيء" و " النفس" و" النور" و"اليد والقدم" على الله تعالى؟ بين مذهب أهل السنة مع الرد على المبتدعين.

আল্লাহর উপর "আল-শাই" (বস্তু), "আন-নাফস" (সত্তা), "আন-নূর" (আলো), "আল-ইয়াদ" (হাত) ও "আল-কদাম" (পা) শব্দগুলোর ব্যবহার কি জায়েজ? আহলুস সুন্নাহর মাযহাব বর্ণনা করুন এবং বিদ'আতীদের খণ্ডন কর।

(٣) مر ما معنى الاستواء؟ أوضح رأى أهل السنة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى.

"ইস্তিওয়া" শব্দের অর্থ কী? আল্লাহর বাণী "আর-রাহমানু আলাল আরশিস্তাওয়া" (দয়াময় আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন) - এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মতামত স্পষ্ট কর।

(٤) من يمكن رؤية الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة؟ بين مذهب أهل السنة مدللا في هذه المسئلة بالوضاحة.

দুনিয়া ও আখিরাতে কারা আল্লাহকে দেখতে পাবে? এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মাযহাব স্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

(٥) هل القرآن كلام الله غير مخلوق؟ بين عقيدة أهل السنة في هذه المسئلة.

কুরআন কি আল্লাহর কালাম (কথা), যা মাখলুক (সৃষ্ট) নয়? এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকীদা বর্ণনা কর।

(٦) هل أفعال العباد مخلوقة الله؟ بين المسئلة مع الرد على مخالفي أهل السنة.

বান্দাদের কর্ম কি আল্লাহর সৃষ্টি? এ বিষয়টি বর্ণনা করুন এবং আহলুস সুন্নাহর বিরোধীদের খণ্ডন কর।

(٧) الإيمان وهل هو يزيد وينقص بين المسئلة مع ذكر أقوال العلماء الصالة

ঈমান কি বাড়ে ও কমে? এ বিষয়টি বর্ণনা করুন এবং সৎকর্মশীল আলেমদের মতামত উল্লেখ কর।

(٨) بين حكم مرتكب الكبيرة بضوء مذاهب العلماء مع ترجيح رأي أهل السنة.

কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তির হুকুম আলেমদের বিভিন্ন মাযহাবের আলোকে বর্ণনা করুন এবং আহলুস সুন্নাহর মতের প্রাধান্য দিন।

(٩) من هم المخاطبون بالإيمان؟ بين حكم قراري المشركين في الآخرة مفصلا.

ঈমানেরمخاطب (যাদের প্রতি ঈমানের আহ্বান) কারা? আখিরাতে মুশরিকদের পরিণতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

(١٠) هل كرامة الأولياء حق؟ بين أدلة ثبوت الكرامة من القرآن والسنة ؟

আওলিয়াদের কারামত কি সত্য? কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কারামত প্রমাণের দলিল বর্ণনা কর।

(١١) عرف الإسراء والمعراج؟ هل المعراج كان في المنام أم في اليقظة مع الروح والجسدة بين رأي أهل السنة مدللا

ইসরা ও মি'রাজের সংজ্ঞা দিন। মি'রাজ কি স্বপ্নে হয়েছিল নাকি জাগ্রত অবস্থায় রুহ ও দেহ উভয়সহ? দলিলের মাধ্যমে আহলুস সুন্নাহর মতামত বর্ণনা কর।

(١٢) لى هل الجنة والنار مخلوقتان الآن وهل هما تغنيان أم تبيدان بين مدلل

জান্নাত ও জাহান্নাম কি বর্তমানে সৃষ্ট? এবং এ দুটি কি শেষ হয়ে যাবে নাকি চিরস্থায়ী থাকবে? দলিলের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

---

(١٣) ما هي أصول الإيمان التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها؟

ঈমানের সেই মূলনীতিগুলো কী কী, যা প্রত্যেক মুসলিমের উপর বিশ্বাস করা ওয়াজিব?

(١٤) ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ وما هي شروطها؟

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই) এবং "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" (মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল) - এই সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ কী? এবং এর শর্তগুলো কী কী?

(١٥) ما هو القضاء والقدر؟ وكيف يجمع المسلم بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين فعل الأسباب؟

ক্বাযা ও ক্বদর কী? এবং একজন মুসলিম কিভাবে ক্বাযা ও ক্বদরের উপর ঈমান আনা এবং উপায় অবলম্বনের মধ্যে সমন্বয় করবে?

(١٦) من هم الرسل؟ وما هي وظيفتهم؟ وما هي أوصافهم التي يجب الإيمان بها؟

রাসূলগণ কারা? তাঁদের দায়িত্ব কী? এবং তাঁদের সেই গুণাবলীগুলো কী কী, যার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব?

(١٧) ما هي الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى؟ وما هي مكانة القرآن الكريم بينها؟

আল্লাহ তা'আলা যে আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন সেগুলো কী কী? এবং সেগুলোর মধ্যে কুরআনুল কারীমের মর্যাদা কী?

(١٨) من هم الملائكة؟ وما هي وظائفهم التي كلفهم الله بها؟

ফেরেশতাগণ কারা? এবং আল্লাহ তাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেগুলো কী কী?

(١٩) ما هو اليوم الآخر؟ وما هي المراحل التي يمر بها الإنسان بعد الموت؟

ইয়াওমুল আখির (শেষ দিবস) কী? এবং মৃত্যুর পর মানুষ যে পর্যায়গুলোর মধ্য দিয়ে যাবে সেগুলো কী কী?

(٢٠) ما هو تعريف العبادة في الإسلام؟ وما هي أنواعها؟

ইসলামে ইবাদতের সংজ্ঞা কী? এবং এর প্রকারভেদগুলো কী কী?

(٢١) ما هي السنة النبوية؟ وما هي حجيتها في الشريعة الإسلامية؟

সুন্নাতে নববী কী? এবং ইসলামী শরীয়তে এর প্রামাণিকতা কতটুকু?

(٢٢) ما هو الإجماع؟ وما هي منزلته كمصدر من مصادر التشريع في الإسلام؟

ইজমা' (ঐক্যমত) কী? এবং ইসলামে শরীয়তের উৎস হিসেবে এর মর্যাদা কী?

(٢٣) ما هو القياس؟ وهل يعتبر مصدراً مستقلاً للتشريع؟

কিয়াস (সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ) কী? এবং এটি কি শরীয়তের একটি স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়?

(٢٤) ما هي البدعة في الدين؟ وما هي أنواعها؟ وما هو حكم ارتكابها؟

দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত (নব উদ্ভাবন) কী? এবং এর প্রকারভেদগুলো কী কী? এবং তা করা হুকুম কী?

(٢٥) ما هو التوحيد العملي؟ وكيف يتحقق في حياة المسلم؟

আমলী তাওহীদ কী? এবং কিভাবে একজন মুসলিমের জীবনে তা বাস্তবায়িত হতে পারে?

(٢٦) ما هي أهمية الأخلاق في الإسلام؟ وما هي بعض الأخلاق التي حث عليها الإسلام؟

ইসলামে আখলাকের (চরিত্র) গুরুত্ব কী? এবং ইসলাম যেসব আখলাকের প্রতি উৎসাহিত করেছে তার কিছু উদাহরণ কী?

(٢٧) ما هو الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان؟

ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের মধ্যে পার্থক্য কী?

(٢٨) ما هي الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر؟

মুজিজা, কারামত ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য কী?

(٢٩) هل يجوز الاستغاثة بغير الله تعالى؟ وما هو حكم الاستعانة بالأموات والأولياء؟

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া কি জায়েজ? মৃত ব্যক্তি ও আওলিয়াদের কাছে সাহায্য চাওয়া হুকুম কী?

(٣٠) ما هو التوسل؟ وما هي أنواعه المشروعة والممنوعة؟

তাওয়াসসুল কী? এবং এর শরীয়তসম্মত ও নিষিদ্ধ প্রকারগুলো কী কী?

(٣١) ما هو حكم زيارة القبور؟ وما هي الآداب التي يجب مراعاتها عند زيارتها؟

কবর যিয়ারতের হুকুম কী? এবং কবর যিয়ারতের সময় কোন কোন আদব (শিষ্টাচার) মেনে চলা উচিত?

(٣٢) ما هو حكم الاحتفال بالموالد والأعياد المبتدعة؟

মীলাদ ও বিদ'আতী ঈদ উদযাপন করার হুকুম কী?

(٣٣) ما هي علامات الساعة الصغرى والكبرى؟ وما هي أهميتها للمسلم؟

কেয়ামতের ছোট ও বড় আলামতগুলো কী কী? এবং একজন মুসলিমের জন্য এর গুরুত্ব কী?

(٣٤) ما هو الشفاعة؟ ومن هم الشافعون يوم القيامة؟

শাফা'আত (সুপারিশ) কী? এবং কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী কারা হবেন?

(٣٥) ما هو الحساب والميزان والصراط؟ وما هي عقيدة أهل السنة في هذه الأمور؟

হিসাব, মিযান (দাঁড়িপাল্লা) ও সিরাত কী? এবং এই বিষয়গুলোতে আহলুস সুন্নাহর আকীদা কী?

(٣٦) ما هي الجنة؟ وما هي النعيم الذي أعده الله للمؤمنين فيها؟

জান্নাত কী? এবং আল্লাহ তাতে মুমিনদের জন্য যে নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন তা কী কী?

(٣٧) ما هي النار؟ وما هو العذاب الذي أعده الله للكافرين والعصاة فيها؟

জাহান্নাম কী? এবং আল্লাহ তাতে কাফির ও পাপীদের জন্য যে শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন তা কী কী?

(٣٨) ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الفرق الضالة والمبتدعة؟

ভ্রান্ত ও বিদ'আতী দলগুলোর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'তের অবস্থান কী?

(٣٩) ما هي أهمية دراسة علم العقيدة للمسلم؟ وما هي الثمرات التي يجنيها من ذلك؟

একজন মুসলিমের জন্য ইলমে আকীদা (বিশ্বাসতত্ত্ব) অধ্যয়নের গুরুত্ব কী? এবং এর মাধ্যমে সে কী ফল লাভ করে?

(٤٠) كيف يمكن للمسلم أن يحافظ على عقيدته من الشبهات والفتن؟

একজন মুসলিম কিভাবে তার আকীদা (বিশ্বাস) কে সন্দেহ ও ফেতনা থেকে রক্ষা করতে পারে?

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নসমূহ:

١. هل الشفاعة حق لمرتكب الكبيرة من المسلمين؟ بين مدللا.

১. মুসলিমদের মধ্যে যে বড় পাপ করেছে, তার জন্য কি সুপারিশের অধিকার আছে? দলীলসহ বর্ণনা কর।

٢. هل عذاب القبر حق؟ بين عقيدة أهل السنة في المسئلة.

২. কবরের আযাব কি সত্য? এই বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকীদা বর্ণনা কর।

٣. عرف الصحابة ثم بين من هو الأفضل منهم عند أهل السنة.

৩. সাহাবীগণ কারা? এরপর আহলুস সুন্নাহর নিকট তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তা বর্ণনা কর।

٤. أثبت ختم النبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالدلائل.

৪. দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সমাপ্তি প্রমাণ কর।

٥. ما الإيمان بالكتب؟ وكم كتابا سماويا أنزله الله تعالى؟

৫. কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা কী? আল্লাহ তা'আলা কতগুলো আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন?

٦. كم عددا للأنبياء والرسل ؟ وكيف الإيمان بهم؟ بين.

৬. নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা কত? তাঁদের উপর ঈমান আনার পদ্ধতি কী? বর্ণনা কর।

▪ লেখক ও কিতাব সম্পর্কে ধারণা

١ -دراسة عن حياة العلامة ابي المعين ميمون النسفي وهي تشمل اسمه وولادته ونشأته العلمية ورحلاته أشهر شيوخه وتلاميذه ومكانته العلمية ومناقبه و أقوال العلماء فيه، ومؤلفاته، ووفاته.

১- আল্লামা আবুল মুঈন মাইমুন আন-নাসাফীর জীবনীর উপর একটি গবেষণা, যা তাঁর নাম, জন্ম, শিক্ষাজীবন, ভ্রমণ, বিখ্যাত শিক্ষক ও ছাত্র, তাঁর জ্ঞানগত মর্যাদা, গুণাবলী, বিদ্বানদের উক্তি, রচনাবলী এবং মৃত্যু অন্তর্ভুক্ত করবে।

▪ আল্লামা আবুল মুঈন মাইমুন আন-নাসাফী: জীবন ও কর্মের উপর একটি গবেষণা

উপস্থাপনা:

আল্লামা আবুল মুঈন মাইমুন বিন মুহাম্মাদ বিন মু'তামাদ আন-নাসাফী (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও মুতাকাল্লিম (ইসলামী দার্শনিক)। তিনি হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি ফিকহ, উসূল, কালাম এবং আরবি সাহিত্যসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর অবদান রেখেছেন। এই গবেষণায় তাঁর নাম, জন্ম, শিক্ষাজীবন, ভ্রমণ, বিখ্যাত শিক্ষক ও ছাত্র, জ্ঞানগত মর্যাদা, গুণাবলী, বিদ্বানদের উক্তি, রচনাবলী এবং মৃত্যু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১. তাঁর নাম ও শিক্ষাজীবন (دراسة عن اسمه ونشأته العلمية):

তাঁর পূর্ণ নাম আবুল মুঈন মাইমুন বিন মুহাম্মাদ বিন মু'তামাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মাকহুল আন-নাসাফী আল-হানাফী (أبو المعين ميمون بن محمد بن معتمد بن محمد بن مكحول النسفي الحنفي)। তিনি "আবুল মুঈন" উপাধি এবং "আন-নাসাফী" উপনামে পরিচিত, যা তাঁর জন্মস্থান নাসাফ (বর্তমান উজবেকিস্তানের কার্শি শহরের নিকটবর্তী একটি প্রাচীন শহর) এর দিকে ইঙ্গিত করে।

তাঁর জন্ম আনুমানিক ৪১৮ হিজরি (১০২৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে নাসাফে হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। তিনি একটি বিদ্বান পরিবারে বেড়ে ওঠেন এবং শৈশব থেকেই জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি নিজ শহরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং এরপর জ্ঞানপিপাসু মন নিয়ে তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন জ্ঞানকেন্দ্রের দিকে যাত্রা করেন। তিনি ফিকহ, হাদিস, তাফসীর, কালাম ও আরবি সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রথিতযশা আলেমদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

২. তাঁর ভ্রমণসমূহ (ودراسة عن رحلاته):

জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে আল্লামা আবুল মুঈন আন-নাসাফী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী জ্ঞানকেন্দ্র ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বুখারা, সমরকন্দ, বাগদাদ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ শহর সফর করেন এবং সেখানকার বিখ্যাত আলেমদের সান্নিধ্যে ইলম অর্জন করেন। এসব ভ্রমণ তাঁকে বিভিন্ন মাযহাব ও চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ

করে দেয় এবং তাঁর জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করে। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে নথিভুক্ত না থাকলেও, তৎকালীন জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলোতে তাঁর গমনাগমন নিঃসন্দেহে তাঁর পাণ্ডিত্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

৩. তাঁর বিখ্যাত শিক্ষকগণ (ودراسة عن أشهر شيوخه):

আল্লামা আবুল মুঈন আন-নাসাফী বহু প্রখ্যাত শিক্ষকের কাছে জ্ঞানার্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য:

- আবুল কাসেম ইসহাক বিন মুহাম্মাদ আস-সামারকান্দি (أبو القاسم إسحاق بن محمد السمرقندي): হানাফী মাযহাবের একজন বিখ্যাত ফকীহ ও উসূলবিদ। তাঁর কাছে আন-নাসাফী ফিকহ ও উসূলুল ফিকহের জ্ঞান লাভ করেন।
- আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-বাস্তামী (أبو سعيد عبد الله بن محمد البسطامي): একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তাঁর কাছে আন-নাসাফী হাদিস ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন।
- অন্যান্য বিদ্বানগণ: তৎকালীন বুখারা, সমরকন্দ ও বাগদাদের অন্যান্য খ্যাতনামা আলেমদের কাছেও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁদের সঠিক তালিকা উদ্ধার করা কঠিন হলেও, তাঁদের সম্মিলিত শিক্ষা তাঁর জ্ঞানভিত্তিকতাকে সুদৃঢ় করেছিল।

৪. তাঁর ছাত্রগণ (ودراسة عن تلاميذه):

আল্লামা আবুল মুঈন আন-নাসাফীর বহু ছাত্র ছিলেন, যারা পরবর্তীতে ইসলামী জ্ঞানচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন:

- আবু হাফস উমর বিন মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (أبو حفص عمر بن محمد النسفي): তাঁর পুত্র এবং একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ। পিতার জ্ঞানের উত্তরাধিকার তিনি বহন করেছিলেন।
- আলাউদ্দীন আবুল বকর মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আস-সামারকান্দি (علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي): হানাফী মাযহাবের একজন বিখ্যাত ফকীহ ও লেখক।
- অন্যান্য বিদ্বানগণ: তাঁর শিক্ষাদানের মাধ্যমে আরও বহু শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জন করে বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া না গেলেও, তাঁর শিক্ষাদানের প্রভাব সুদূরপ্রসারী ছিল।

৫. তাঁর জ্ঞানগত মর্যাদা (ودراسة عن مكانته العلمية):

আল্লামা আবুল মুঈন আন-নাসাফী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন স্তম্ভস্বরূপ। ফিকহ, উসূলুল ফিকহ, কালাম (ইসলামী দর্শন), তাফসীর ও হাদিস শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। বিশেষ করে কালাম শাস্ত্রে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মাতুরিদিয়া দর্শনের একজন প্রখ্যাত ইমাম হিসেবে বিবেচিত হন এবং এই মতবাদের সমর্থনে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত "তাবসিরাতুল আদিল্লা ফি উসূলিদ দ্বীন" (تبصرة الأدلة في أصول الدين) মাতুরিদিয়া দর্শনের একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত। তাঁর জ্ঞানগত মর্যাদা কেবল তাঁর সমসাময়িক আলেমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং পরবর্তী প্রজন্মের বিদ্বানদের কাছেও তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

৬. তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ (ودراسة عن مناقبه):

আল্লামা আবুল মুঈন আন-নাসাফী কেবল একজন প্রাজ্ঞ পণ্ডিতই ছিলেন না, বরং তিনি বহু চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো:

- গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা: ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল এবং তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে সেই জ্ঞান বিতরণ করতেন।
- অসাধারণ স্মৃতিশক্তি: তিনি অনেক ইলম আয়ত্ত করেছিলেন এবং জটিল বিষয়গুলো সহজে মনে রাখতে পারতেন।
- যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা: তিনি অত্যন্ত যৌক্তিক ও প্রমাণের ভিত্তিতে আলোচনা করতেন এবং প্রতিপক্ষের মতামত খণ্ডনে পারদর্শী ছিলেন।
- মাতুরিদিয়া দর্শনের দৃঢ় সমর্থক: তিনি মাতুরিদিয়া আকিদার সমর্থনে শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করতেন এবং এই মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
- সরল জীবনযাপন: জ্ঞানের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এই বিদ্বান অত্যন্ত সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন।
- ধৈর্য ও সহনশীলতা: জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে এবং বিরোধীদের সাথে আলোচনায় তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতেন।

৭. তাঁর সম্পর্কে আলেমদের উক্তি (ودراسة عن أقوال العلماء فيه):

আল্লামা আবুল মুঈন আন-নাসাফী তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও বহু আলেমের প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। হানাফী মাযহাবের অনুসারী এবং কালাম শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ তাঁর গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য এবং মূল্যবান রচনাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁকে মাতুরিদিয়া দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর রচিত "তাবসিরাতুল আদিল্লা" গ্রন্থের গুরুত্ব এবং এর ব্যাপক পঠন-পাঠনই তাঁর জ্ঞানগত মর্যাদার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরবর্তী প্রজন্মের বহু আলেম তাঁর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং তাঁর মতামতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন।

৮. তাঁর রচনাবলী (ودراسة عن مؤلفاته):

আল্লামা আবুল মুঈন আন-নাসাফী ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কিছু কাজ হলো:

- তাবসিরাতুল আদিল্লা ফি উসূলিদ দ্বীন (تبصرة الأدلة في أصول الدين): মাতুরিদিয়া দর্শনের উপর এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। এতে ইসলামী আকীদার বিভিন্ন দিক যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
- আত-তামহীদ লি-ক্বাওয়াইদুত তাওহীদ (التمهيد لقواعد التوحيد): এটিও আকাইদ শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।
- আল-উমদাতু ফি উসূলিল ফিকহ (العمدة في أصول الفقه): হানাফী উসূলুল ফিকহের উপর রচিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ।
- শারহু জামি'ইস সাগীর (شرح جامع الصغير): ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শায়বানীর "আল-জামি' আস-সগীর"-এর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
- কিতাবুল জামি' (كتاب الجامع): ফিকহ বিষয়ক একটি গ্রন্থ।

তাঁর রচনাবলী ইসলামী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ এবং আজও গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

৯. তাঁর মৃত্যু (ودراسة عن وفاته):

আল্লামা আবুল মুঈন আন-নাসাফী ৪৯৮ হিজরি (১১০৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে তাঁর জন্মস্থান নাসাফে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে ইসলামী জ্ঞান জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তিনি তাঁর জ্ঞান, কর্ম ও রচনাবলীর মাধ্যমে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং তাঁর অবদান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জ্ঞানপিপাসুদের পথ আলোকিত করবে।

উপসংহার: আল্লামা আবুল মুঈন আন-নাসাফী ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন প্রখর জ্যোতিষ্ক এবং মাতুরিদিয়া দর্শনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। তাঁর জীবন জ্ঞানার্জনের নিরলস সাধনা, গভীর পাণ্ডিত্য এবং মূল্যবান রচনাবলীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই গবেষণা তাঁর বহুমুখী প্রতিভা এবং ইসলামী জ্ঞান চর্চায় তাঁর অসামান্য অবদানকে তুলে ধরার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। আরও বিস্তারিত গবেষণা ও তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই মহান বিদ্বানের জীবন ও কর্মের আরও অনেক দিক উন্মোচিত হতে পারে।

٢ -دراسة عن كتاب بحر الكلام وهي تشمل ميزاته وخصائصه ومنهج المؤلف فيه ومنزلته بين كتب العقائد وعناية العلماء به.

২- "বাহরুল কালাম" গ্রন্থটির উপর একটি গবেষণা, যা এর বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, লেখকের পদ্ধতি, আকাইদের গ্রন্থাবলীতে এর অবস্থান এবং বিদ্বানদের এর প্রতি মনোযোগ অন্তর্ভুক্ত করবে।

▪ "বাহরুল কালাম" গ্রন্থটির উপর একটি গবেষণা

উপস্থাপনা:

"বাহরুল কালাম ফি ইলমিত তাওহীদ" (بحر الكلام في علم التوحيد) অথবা সংক্ষেপে "বাহরুল কালাম" (بحر الكلام) হলো হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম ও মাতুরিদিয়া দর্শনের অন্যতম স্তম্ভ আল্লামা আবুল মুঈন মাইমুন আন-নাসাফী (রহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক রচিত আকাইদ (ইসলামী বিশ্বাস) শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ইসলামী তাওহীদ (একত্ববাদ), আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী, নবুওয়াত এবং অন্যান্য মৌলিক আকাইদ যৌক্তিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, লেখকের পদ্ধতি, আকাইদের গ্রন্থাবলীতে এর অবস্থান এবং বিদ্বানদের এর প্রতি মনোযোগ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

১. এর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য (دراسة عن ميزاته وخصائصه):

“বাহরুল কালাম” গ্রন্থটির বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এটিকে আকাইদ শাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আলাদা করে তুলেছে:

- মাতুরিদিয়া দর্শনের প্রামাণিক উৎস: এটি ইমাম আবুল মানসুর আল-মাতুরিদীর (রহ.) প্রতিষ্ঠিত আকাইদের মাতুরিদিয়া মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই মতবাদের যৌক্তিক ও দার্শনিক ভিত্তি বুঝতে এটি অপরিহার্য।
- সুস্পষ্ট ও যৌক্তিক আলোচনা: গ্রন্থটিতে আন-নাসাফী (রহ.) অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও যৌক্তিক পদ্ধতিতে আকাইদের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণের উপরও জোর দিয়েছেন।
- বিতর্কিত বিষয়গুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা: গ্রন্থে আকাইদের বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়, যেমন আল্লাহর গুণাবলী, তাকদীর, ঈমান ও ইসলামের স্বরূপ ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং অন্যান্য ফেরকাগুলোর (যেমন মু'তাযিলা, জাহমিয়া) মতবাদের খণ্ডন করা হয়েছে।
- সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ উপস্থাপনা: “তাবসিরাতুল আদিল্লা”-র মতো বৃহৎ গ্রন্থের তুলনায় “বাহরুল কালাম” তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত, তবে এটি আকাইদের মৌলিক বিষয়গুলো অত্যন্ত সারগর্ভভাবে উপস্থাপন করে।
- শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী: এর সহজবোধ্য ভাষা ও সুবিন্যস্ত আলোচনা শিক্ষার্থীদের জন্য মাতুরিদিয়া আকাইদ বুঝতে সহায়ক।

২. এতে লেখকের পদ্ধতি (ودراسة عن منهج المؤلف فيه):

আল্লামা আবুল মুঈন আন-নাসাফী (রহ.) “বাহরুল কালাম” রচনার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন:

- বিষয়ভিত্তিক আলোচনা: তিনি প্রতিটি আকাইদের মূল বিষয়কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন।
- যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপন: প্রতিটি বিষয়ের সমর্থনে তিনি যৌক্তিক ও দার্শনিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।
- কুরআন ও সুন্নাহর উদ্ধৃতি: প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর আয়াত ও হাদিস উদ্ধৃত করেছেন।
- অন্যান্য মতবাদের খণ্ডন: বিতর্কিত বিষয়গুলোতে অন্যান্য ইসলামী ফেরকাগুলোর মতামত উল্লেখ করে তা যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন।
- প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (ক্ষেত্রবিশেষে): কোথাও কোথাও প্রশ্ন উত্থাপন করে তার উত্তর প্রদানের মাধ্যমে বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন।
- সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট ভাষা ব্যবহার: তিনি জটিল দার্শনিক বিষয়গুলোও সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

৩. আকাইদের গ্রন্থাবলীতে এর অবস্থান (ودراسة عن منزلته بين كتب العقائد):

“বাহরুল কালাম” আকাইদ শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে:

- মাতুরিদিয়া আকাইদের অন্যতম ভিত্তি: এটি মাতুরিদিয়া মতবাদের অনুসারীদের জন্য অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই মতবাদ বুঝতে এর অধ্যয়ন অপরিহার্য।
- “তাবসিরাতুল আদিল্লা”-র পরিপূরক: যদিও “তাবসিরাতুল আদিল্লা” আন-নাসাফীর বৃহৎ ও বিস্তারিত গ্রন্থ, “বাহরুল কালাম” সংক্ষিপ্ত আকারে একই বিষয়গুলো উপস্থাপন করায় এটি দ্রুত পঠন ও আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- শিক্ষাঙ্গনে গুরুত্ব: বহু ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এটি আকাইদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত।
- পরবর্তী লেখকদের জন্য উৎস: পরবর্তী প্রজন্মের বহু আলেম ও লেখক এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং এর আলোচনাকে তাদের রচনায় স্থান দিয়েছেন।

৪. বিদ্বানদের এর প্রতি মনোযোগ ও যত্ন (وعناية العلماء به):

“বাহরুল কালাম” প্রকাশের পর থেকেই বিদ্বানদের ব্যাপক মনোযোগ ও যত্ন লাভ করেছে:

- পঠন ও শিক্ষাদান: বহু আলেম এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেছেন এবং তাদের ছাত্রদেরকে শিক্ষাদান করেছেন।
- ব্যাখ্যা ও ভাষ্য: যদিও “তাবসিরাতুল আদিল্লা”-র উপর বেশি ভাষ্য লেখা হয়েছে, “বাহরুল কালাম”-এর গুরুত্বও বিদ্বানদের কাছে কম ছিল না। এর বিভিন্ন জটিল অংশ নিয়ে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।
- উদ্ধৃতি ও অনুসরণ: পরবর্তী প্রজন্মের আকাইদ শাস্ত্রের লেখকরা প্রায়শই এই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং এর মতামতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন।
- পুনঃপ্রকাশ ও প্রচার: গ্রন্থটি বহুবার মুদ্রিত ও পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে, যা এর স্থায়ী গুরুত্ব ও চাহিদার প্রমাণ।

উপসংহার:

“বাহরুল কালাম” আল্লামা আবুল মুঈন আন-নাসাফীর একটি মূল্যবান অবদান, যা মাতুরিদিয়া আকাইদ বোঝার জন্য অপরিহার্য। এর বৈশিষ্ট্য, লেখকের পদ্ধতি এবং আকাইদ শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে এর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। বিদ্বানদের নিরন্তর মনোযোগ ও যত্ন এই গ্রন্থের গুরুত্বকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এটি ভবিষ্যতেও আকাইদ শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে।

٣ -دراسة عن مصطلح العقيدة : تعريفها وموضوعها وغرضها وأهميتها ومصادرها ونشأتها وتطورها وأشهر المؤلفات فيها و أبرز الشخصيات في هذا الفن.

৩- আকীদা (বিশ্বাস) পরিভাষার উপর একটি গবেষণা: এর সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, উৎস, উৎপত্তি, বিকাশ, এই বিষয়ে বিখ্যাত রচনাবলী এবং এই শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

▪ **আকীদা পরিভাষার উপর একটি গবেষণা:** সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, উৎস, উৎপত্তি, বিকাশ, বিখ্যাত রচনাবলী ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

▪ **উপস্থাপনা:**

"আকীদা" (عقيدة) আরবি ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা, যা ইসলামী শরীয়তে মৌলিক বিশ্বাস ও নীতিমালার সমষ্টিকে বোঝায়। একজন মুসলিমের ঈমানের ভিত্তি হলো এই আকীদা। এই গবেষণায় আকীদা পরিভাষার সংজ্ঞা, এর বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, উৎস, উৎপত্তি ও বিকাশ, এই বিষয়ে রচিত বিখ্যাত গ্রন্থাবলি এবং আকীদা শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১. আকীদার সংজ্ঞা (تعريف العقيدة):

আভিধানিক অর্থে আকীদা (عقيدة) শব্দটি 'আকাদা' (عقد) ধাতু থেকে উৎকলিত, যার অর্থ হলো বাঁধা, দৃঢ় করা, স্থির করা, বিশ্বাস করা, প্রতিজ্ঞা করা ইত্যাদি।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আকীদা বলতে ঐসব মৌলিক বিশ্বাস ও নীতিসমূহকে বোঝায় যার উপর একজন মুসলিম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মনে প্রাণে গ্রহণ করে। এটি এমন জ্ঞান ও বিশ্বাসকে অন্তর্ভুক্ত করে যা সন্দেহ ও দ্বিধাহীনভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে এবং যার ভিত্তিতে একজন মুসলিমের জীবন পরিচালিত হয়। সংক্ষেপে, আকীদা হলো ইসলামের সেই অপরিহার্য বিশ্বাসসমূহ যা কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত এবং যা অস্বীকার করলে ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২. আকীদার বিষয়বস্তু (موضوع العقيدة):

আকীদার মূল বিষয়বস্তু হলো আল্লাহ তা'আলার সত্তা, তাঁর গুণাবলী, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত (পরকাল), তাকদীর (ভাগ্যলিপি) এবং গায়েবের (অদৃশ্য) বিষয়সমূহ। এটিকে সাধারণত নিম্নলিখিত স্তম্ভগুলোতে ভাগ করা হয়:

- ঈমান বিল্লাহ (الإيمان بالله): আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস, তাঁর সুন্দর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস এবং তাঁর রুবুবিয়্যাত (কর্তৃত্ব), উলুহিয়্যাত (ইবাদতের একমাত্র হকদার) ও আসমা ওয়াস সিফাত (নাম ও গুণাবলী)-তে বিশ্বাস করা।
- ঈমান বিল মালাইকা (الإيمان بالملائكة): ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাদের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলীতে বিশ্বাস করা।
- ঈমান বিল কুতুব (الإيمان بالكتب): আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত কিতাবসমূহে বিশ্বাস করা, যেমন কুরআন, তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ইত্যাদি। তবে বর্তমানে একমাত্র কুরআনই অপরিবর্তিত ও অনুসরণযোগ্য।
- ঈমান বির রুসুল (الإيمان بالرسل): আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস করা, তাদের নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করা এবং শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রিসালাতের উপর ঈমান আনা।
- ঈমান বিল ইয়াওমিল আখির (الإيمان باليوم الآخر): কিয়ামত, হাশর, মিজান, জান্নাত, জাহান্নাম এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সকল পর্যায়ে বিশ্বাস করা।
- ঈমান বিল কাদার (الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى): তাকদীরের ভালো ও মন্দের উপর বিশ্বাস করা যে সবকিছু আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছানুসারে সংঘটিত হয়।
- এছাড়াও গায়েবের অন্যান্য বিষয়, যেমন জিন, শয়তান, কবরের আযাব ও নিয়ামত ইত্যাদি আকীদার অন্তর্ভুক্ত।

৩. আকীদার উদ্দেশ্য (غرض العقيدة):

আকীদার প্রধান উদ্দেশ্য হলো:

- আল্লাহর পরিচয় ও একত্ববাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা এবং তাঁর সাথে বান্দার সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করা।
- জীবন ও জগতের সৃষ্টি রহস্য এবং মানুষের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত হওয়া।
- সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে নিজেকে রক্ষা করা।
- মানসিক প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জন করা এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা।
- নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।
- ইসলামের মৌলিক নীতি ও আদর্শের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করা।
- মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা এবং বিভেদ ও অনৈক্য পরিহার করা।

৪. আকীদার গুরুত্ব (أهمية العقيدة):

ইসলামে আকীদার গুরুত্ব অপরিসীম। এর গুরুত্ব নিম্নলিখিত দিকগুলো থেকে উপলব্ধি করা যায়:

- ঈমানের ভিত্তি: আকীদা হলো ঈমানের মূল ভিত্তি। এটি ব্যতীত কোনো আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।
- ইসলামের মূল স্তম্ভ: আকীদা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভসমূহের মধ্যে অন্যতম।
- সঠিক পথের দিশারী: আকীদা মানুষকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে এবং সরল পথে চলতে সাহায্য করে।

- আমলের শুদ্ধতা: আকীদার বিশুদ্ধতার উপর আমলের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল। ভুল আকীদার উপর ভিত্তি করে কোনো সৎকর্ম আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।
- আত্মিক প্রশান্তি: সঠিক আকীদা মানুষের মনকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ করে তোলে এবং হতাশা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়।
- সামাজিক ঐক্য: একই আকীদার উপর বিশ্বাস মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে।
- জান্নাতের পথ: সঠিক আকীদার অনুসারীরাই আখিরাতে জান্নাত লাভ করবে।

৫. আকীদার উৎস (مصادر العقيدة):

আকীদার প্রধান উৎস হলো:

- আল-কুরআনুল কারীম (القرآن الكريم): আল্লাহ তা'আলার বাণী, যা আকীদার মৌলিক বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করে।
- আস-সুন্নাতুন নাবাবিয়্যাহ আস-সাহীহা (السنة النبوية الصحيحة): রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশুদ্ধ হাদিস ও তাঁর জীবনযাপন আকীদার অনেক বিষয়কে ব্যাখ্যা করে এবং বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে।

আকীদার ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তিরও একটি ভূমিকা রয়েছে, তবে তা কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির বিরোধী হতে পারবে না। সাহাবা, তাবেঈন ও সালাফে সালেহীনদের (প্রথম তিন প্রজন্মের মুসলিম) বুঝ ও ব্যাখ্যার অনুসরণ আকীদা গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬. আকীদার উৎপত্তি ও বিকাশ (نشأة العقيدة وتطورها):

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় আকীদার মূলনীতিগুলো সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সেগুলোর উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। রাসূল (সাঃ) স্বয়ং আকীদার মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দিতেন এবং কোনো প্রকার বিভ্রান্তি দেখা দিলে তার নিরসন করতেন।

রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর ফিতনা ও বিভিন্ন ভ্রান্ত ফেরকার আত্মপ্রকাশের কারণে আকীদার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের সূচনা হয়। বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কিছু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতভেদ দেখা দেয় যা পরবর্তীতে বিভিন্ন আকীদাগত ফেরকার জন্ম দেয়।

পরবর্তীতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে সঠিক আকীদা প্রতিষ্ঠা এবং ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনের জন্য কলম ধরেন। এর ফলস্বরূপ আকীদা শাস্ত্র একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান শাখা হিসেবে বিকশিত হয় এবং এর উপর বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়।

৭. আকীদা বিষয়ে বিখ্যাত রচনাবলী (أشهر المؤلفات فيها):

আকীদা শাস্ত্রের উপর বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু বিখ্যাত গ্রন্থ হলো:

- আল-ফিকহুল আকবার (الفقه الأكبر) - ইমাম আবু হানীফা (রহ.)
- কিতাবুস সুন্নাহ (كتاب السنة) - ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)
- আস-সুন্নাহ (السنة) - আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)
- শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) - ইমাম লালকায়ী (রহ.)

- আল-ই'তিকাদ (الاعتقاد) - ইমাম বায়হাকী (রহ.)
- আল-উসূলুস সালাসা (الأصول الثلاثة) - শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহ.)
- কিতাবুত তাওহীদ (كتاب التوحيد) - শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহ.)
- শারহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যাহ (شرح العقيدة الطحاوية) - বিভিন্ন বিদ্বান কর্তৃক রচিত
- আল-আকীদাতুল ওয়াসিতিয়্যাহ (العقيدة الواسطية) - শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.)
- লামিয়্যাতুল আফ'আল (لامية الأفعال) - ইবনে মালিক (রহ.) (আকীদার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত)
- তাবসিরাতুল আদিল্লা ফি উসূলিদ দ্বীন (تبصرة الأدلة في أصول الدين) - আবুল মুঈন আন-নাসাফী (রহ.)
- বাহরুল কালাম ফি ইলমিত তাওহীদ (بحر الكلام في علم التوحيد) - আবুল মুঈন আন-নাসাফী (রহ.)

এছাড়াও আরও অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ আকীদা শাস্ত্রের উপর রচিত হয়েছে।

৮. আকীদা শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব (أبرز الشخصيات في هذا الفن):

আকীদা শাস্ত্রের বিকাশে বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন:

- সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ): বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) আকীদার মূলনীতি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।
- তাবেঈন ও তাবে'তাবেঈন (রহ.): হাসান আল-বাসরী (রহ.), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ.) প্রমুখ প্রাথমিক যুগের বিদ্বানগণ আকীদার বিশুদ্ধতা রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন।
- ইমাম আবু হানীফা (রহ.): হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং আকীদা বিষয়ে তাঁর "আল-ফিকহুল আকবার" একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।
- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.): আহলুস সুন্নাহর আকীদা প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।
- ইমাম লালকায়ী (রহ.): "শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ" গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি আহলুস সুন্নাহর আকীদা একত্রিত করেছেন।
- ইমাম বায়হাকী (রহ.): হাদিস ও আকীদা উভয় শাস্ত্রে তাঁর অবদান রয়েছে।
- শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.): আকীদা বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি অত্যন্ত প্রভাবশালী।
- ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহ.): তাওহীদের উপর তাঁর জোর এবং শিরক বিরোধী আন্দোলন আকীদা শাস্ত্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।
- আবুল হাসান আল-আশ'আরী (রহ.): আশ'আরী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে আহলুস সুন্নাহর আকীদা প্রতিষ্ঠা করেন।
- আবু মানসুর আল-মাতুরিদী (রহ.): মাতুরিদী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, হানাফী আলেমদের মধ্যে আকীদার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- আবুল মুঈন আন-নাসাফী (রহ.): মাতুরিদী মতবাদের অন্যতম প্রধান ইমাম এবং "তাবসিরাতুল আদিল্লা" ও "বাহরুল কালাম"-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা।

এছাড়াও আরও অসংখ্য আলেম ও পণ্ডিত আকীদা শাস্ত্রের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন।

উপসংহার:

আকীদা ইসলামী শরীয়তের ভিত্তি এবং একজন মুসলিমের জীবনের মূল চালিকাশক্তি। এর সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং এর উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। আকীদা পরিভাষার তাৎপর্য, এর বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, উৎস, উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা আমাদের ঈমানকে মজবুত করতে এবং সরল পথে অবিচল থাকতে সাহায্য করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিক আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফিক দান কর।

▪ ক) বিস্তারিত প্রশ্ন: ১০টি থাকবে ৮টির উত্তর দিতে হবে: ৮×১০=৮০

ক) বিস্তারিত প্রশ্নসমূহ

(১) عرف التوحيد ثم اذكر أركانه، هل صفة الله تعالى الذاتية والفعلية قديمة؟ بين

তাওহীদের সংজ্ঞা দিন, অতঃপর এর রোকনগুলো (স্তম্ভ) উল্লেখ কর। আল্লাহর যাতী (সত্তা বিষয়ক) ও ফে'লী (কর্ম বিষয়ক) সিফাত কি কাদীম (অনাদি)? বর্ণনা কর।

উত্তর: উপস্থাপনা: আবুল মুঈন আন-নাসাফী (রহ.) 'বাহরুল কালাম'-এ তাওহীদকে ইসলামের মূল ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর আলোচনায় তাওহীদ কেবল একটি তাত্ত্বিক বিশ্বাস নয়, বরং এটি এমন এক জ্ঞান যা মানুষের চিন্তা, কর্ম ও সমগ্র জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আন-নাসাফী (রহ.) এর মতে তাওহীদের তাৎপর্য বহুমাত্রিক।

প্রথমত, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির সম্পর্ক নির্ধারণ: তাওহীদের জ্ঞান মানুষকে এই সত্য উপলব্ধি করায় যে আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও নিয়ন্ত্রক। তিনি সর্বশক্তিমান এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। এই উপলব্ধি মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হতে শেখায় এবং সৃষ্টির প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ বা ভয় থেকে মুক্তি দেয়। একজন মুমিন জানে যে যা কিছু হয় আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়, তাই সে একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য চায়।

দ্বিতীয়ত, ইবাদতের একমাত্র হকদার আল্লাহ: তাওহীদের জ্ঞান মানুষকে শেখায় যে একমাত্র আল্লাহই ইবাদতের যোগ্য। তাঁর সাথে অন্য কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা শক্তির ইবাদত করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আন-নাসাফী (রহ.) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে সকল প্রকার ইবাদত - যেমন সালাত, সাওম, যিকির, দোয়া, কুরবানী ইত্যাদি - একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হতে হবে। এই বিশ্বাস মুমিনকে শিরকের অন্ধকার থেকে রক্ষা করে এবং খাঁটি ইবাদতের দিকে ধাবিত করে।

তৃতীয়ত, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর সঠিক জ্ঞান: 'বাহরুল কালাম'-এ আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ (আল-আসমাউল হুসনা) এবং পরিপূর্ণ গুণাবলী (সিফাত আল-উলইয়া) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আন-নাসাফী (রহ.) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার উপর ভিত্তি করে এই নাম ও গুণাবলীকে কোনো প্রকার বিকৃতি, বিলুপ্তি, সাদৃশ্য স্থাপন বা ধরণ নির্ধারণ ব্যতীত আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করার গুরুত্বারোপ করেছেন। এই জ্ঞান মুমিনকে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ভয় ও সম্মান জানাতে সাহায্য করে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে উৎসাহিত করে।

চতুর্থত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি: তাওহীদের জ্ঞান একজন মুমিনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। যখন একজন ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা এবং তার সকল কর্মের হিসাব নেবেন, তখন সে অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং ন্যায় ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়। তাওহীদের জ্ঞান আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়ার (আল্লাহভীতি) ভিত্তি স্থাপন করে।

পঞ্চমত, সামাজিক জীবনে প্রভাব: তাওহীদের সঠিক উপলব্ধি সমাজে ন্যায়বিচার, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। যখন মানুষ এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয়, তখন তাদের মধ্যে জাতি, বর্ণ, গোত্র বা ভাষার ভেদাভেদ কমে আসে এবং পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়।

- **কিভাবে এই জ্ঞান একজন মুমিনের জীবনকে প্রভাবিত করে:**

তাওহীদের জ্ঞান একজন মুমিনের জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে:

- বিশ্বাস (ঈমান): তাওহীদ ঈমানের মূল ভিত্তি। এটি আল্লাহর একত্ব, তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান দান করে, যা ঈমানকে মজবুত করে।

- ইবাদত (আমল): তাওহীদের জ্ঞান ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করতে শেখায় এবং সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত রাখে।

- আচরণ (আখলাক): তাওহীদের জ্ঞান মুমিনকে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ হতে উৎসাহিত করে। সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উত্তম চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হয়।

- মনোভাব (নফসিয়াত): তাওহীদের জ্ঞান মুমিনকে আল্লাহর উপর ভরসা করতে শেখায় এবং বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণের মানসিক শক্তি যোগায়। সে আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকে।

- সামাজিক সম্পর্ক (মু'আমালাত): তাওহীদের জ্ঞান মুমিনকে সকলের সাথে ইনসাফপূর্ণ ও দয়াপূর্ণ আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করে এবং সমাজে শান্তি ও harmony বজায় রাখতে সাহায্য করে।

উপসংহার: আবুল মুঈন আন-নাসাফী (রহ.) এর 'বাহরুল কালাম' গ্রন্থে তাওহীদের তাৎপর্য অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে তাওহীদ কেবল একটি মৌখিক স্বীকৃতি নয়, বরং

এটি এমন এক গভীর বিশ্বাস যা মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে দেয়। একজন মুমিনের জন্য তাওহীদের সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং তার আলোকে জীবন পরিচালনা করা অপরিহার্য। 'বাহরুল কালাম'-এর আলোকে তাওহীদের তাৎপর্য অনুধাবন আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা তাদেরকে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভে সহায়ক হবে।

(২) هل يجوز إطلاق لفظ "الشيء" و " النفس" و" النور" و"اليد والقدم" على الله تعالى؟ بين مذهب أهل السنة مع الرد على المبتدعين.

আল্লাহর উপর "আল-শাই" (বস্তু), "আন-নাফস" (সত্তা), "আন-নূর" (আলো), "আল-ইয়াদ" (হাত) ও "আল-কদাম" (পা) শব্দগুলোর ব্যবহার কি জায়েজ? আহলুস সুন্নাহর মাযহাব বর্ণনা করুন এবং বিদ'আতীদের খণ্ডন কর।

- **আল্লাহর উপর "আল-শাই", "আন-নাফস", "আন-নূর", "আল-ইয়াদ" ও "আল-কদাম" শব্দগুলোর ব্যবহার:**

আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে কিছু শব্দ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। তা হলো, আল্লাহর জন্য সেই সকল নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করা যা কুরআন ও সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে অথবা যা শরীয়তের মূলনীতি বিরোধী নয়। এক্ষেত্রে নিজস্ব মনগড়া কোনো নাম বা গুণাবলী আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা জায়েজ নয়।

এখন আলোচ্য শব্দগুলোর বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মাযহাব এবং বিদ'আতীদের খণ্ডন আলোচনা করা হলো:

- **আল-শাই (الشيء) - বস্তু:**

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে, সাধারণভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য "শাই" (বস্তু) শব্দটি ব্যবহার করা অনুচিত। কারণ "শাই" শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা মূর্ত ও বিমূর্ত উভয় কিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে এবং এর দ্বারা আল্লাহর সত্তার অপূর্ণতা বা সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতার ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তবে, যদি এর দ্বারা আল্লাহর সত্তার বিদ্যমানতা (existence) বোঝানো হয় এবং সৃষ্টির সাথে কোনো প্রকার তুলনা বা সাদৃশ্য উদ্দেশ্য না থাকে, তবে কোনো কোনো সালাফে সালেহীন থেকে এর ব্যবহার সামান্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সতর্কতা হিসেবে এই শব্দটি পরিহার করাই উত্তম।

বিদ'আতীদের খণ্ডন: কিছু বিদ'আতী গোষ্ঠী আল্লাহর সত্তাকে অন্যান্য বস্তুর মতো মনে করে বা তাঁর গুণাবলীকে সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে তুলনা করে। "শাই" শব্দের ব্যাপক ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে তারা আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে

ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে। তাই, আহলুস সুন্নাহ এই ধরনের অস্পষ্ট ও ভুল ধারণাপ্রসূত শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন।

- **আন-নাফস (النفس) - সত্তা:**

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলার জন্য "নাফস" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা আল-আন'আমের ৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে: "كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ" (তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর দয়া লিখে নিয়েছেন)। এখানে "নাফস" শব্দটি আল্লাহর সত্তাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং, কুরআন মাজীদের স্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলার জন্য "আন-নাফস" শব্দটি ব্যবহার করা জায়েজ। তবে, এই শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের সত্তার সাথে কোনো প্রকার তুলনা করা যাবে না। আল্লাহর সত্তা সকল সৃষ্টির সত্তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অতুলনীয়।

বিদ'আতীদের খণ্ডন: কিছু বিদ'আতী গোষ্ঠী "নাফস" শব্দের অপব্যাখ্যা করে আল্লাহর সত্তাকে সৃষ্টির অংশের মতো বা মানুষের আত্মার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করে। আহলুস সুন্নাহ এই ধরনের তুলনার কঠোর বিরোধিতা করেন এবং কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লাহর সত্তার অতুলনীয়তা প্রমাণ করেন।

- **আন-নূর (النور) - আলো:**

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলার জন্য "নূর" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা আন-নূরের ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে: "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" (আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর নূর)। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে, এখানে "নূর" শব্দটি আল্লাহর একটি গুণ বা তাঁর সত্তার একটি বিশেষ জ্যোতির্ময় অবস্থাকে বোঝায়, যা সকল প্রকার অন্ধকার ও অজ্ঞতা দূরকারী। তবে, এই "নূর" সৃষ্টির নূরের মতো নয়। আল্লাহর নূর তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

বিদ'আতীদের খণ্ডন: কিছু বিদ'আতী গোষ্ঠী আল্লাহর নূরকে সৃষ্টির নূরের সাথে তুলনা করে অথবা এর ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করতে চায়। আহলুস সুন্নাহ কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে আল্লাহর "নূর" গুণকে তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেন এবং সৃষ্টির সাথে এর যেকোনো প্রকার সাদৃশ্যকে প্রত্যাখ্যান করেন।

- **আল-ইয়াদ (اليد) - হাত ও আল-কদাম (القدم) - পা:**

কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহ তা'আলার জন্য "ইয়াদ" (হাত) এবং "কদাম" (পা) শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন "ইয়াদ" সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ আছে (যেমন সূরা আল-ফাতহ: ১০)। তেমনি সহীহ হাদীসে "কদাম" এর উল্লেখ পাওয়া যায় (যেমন জাহান্নামের বর্ণনা সংক্রান্ত হাদীস)।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ মত হলো, আল্লাহর জন্য এই শব্দগুলো তাদের বাহ্যিক অর্থের উপর বিশ্বাস করতে হবে, তবে কোনো প্রকার তা'তীল (গুণাবলী অস্বীকার), তামসীল (সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য স্থাপন), তাকয়ীফ (ধরণ নির্ধারণ) এবং তাহরীফ (বিকৃত ব্যাখ্যা) ব্যতীত। অর্থাৎ, আল্লাহর "হাত" বা "পা" আছে, কিন্তু তা কেমন, কিভাবে তা তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত, তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। এগুলো সৃষ্টির হাত বা পায়ের মতো নয়। আল্লাহর গুণাবলী তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

বিদ'আতীদের খণ্ডন: এক্ষেত্রে বিদ'আতীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। একদল (যেমন মু'আত্তিলা) এই গুণাবলীগুলোকে অস্বীকার করে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করে। তারা বলে আল্লাহর "হাত" মানে ক্ষমতা বা অনুগ্রহ। আরেক দল (যেমন মুজাসসিমা ও মুশাব্বিহা) আল্লাহর গুণাবলীকে সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করে এবং তাঁর জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করে। আহলুস সুন্নাহ উভয় দলের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন। তারা কুরআন ও সহীহ হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্যের উপর ঈমান রাখেন এবং এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তার মতোই অতুলনীয়।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি:

আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি হলো:

১. কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ: আল্লাহর জন্য সেই সকল নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করা যা কুরআন ও সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

২. গুণাবলী অস্বীকার না করা (ইসবাত): কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত আল্লাহর কোনো গুণাবলী অস্বীকার না করা।

৩. সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য স্থাপন না করা (তানযীহ): আল্লাহর গুণাবলীকে সৃষ্টির গুণাবলীর সাথে তুলনা না করা। আল্লাহ সকল প্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র।

৪. গুণাবলীর ধরণ নির্ধারণ না করা (তাকয়ীফ): আল্লাহর গুণাবলী কিভাবে তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত বা এর ধরণ কেমন, তা নির্ধারণ করার চেষ্টা না করা। এটা মানুষের জ্ঞানের বাইরে।

৫. বিকৃত ব্যাখ্যা না করা (তাহরীফ): কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট ভাষ্যের বিকৃত ব্যাখ্যা না করা।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহর ক্ষেত্রে "আল-শাই" শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহার না করাই উত্তম। "আন-নাফস" ও "আন-নূর" শব্দদ্বয় কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় তা ব্যবহার করা জায়েজ, তবে সৃষ্টির সাথে কোনো প্রকার তুলনা ব্যতীত। "আল-ইয়াদ" ও "আল-কদাম" শব্দদ্বয় কুরআন ও সহীহ হাদীসে সাব্যস্ত হওয়ায় এগুলোকেও বাহ্যিক অর্থের উপর বিশ্বাস করতে হবে, তবে তা'তীল, তামসীল, তাকয়ীফ ও তাহরীফ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের এই ভারসাম্যপূর্ণ আকীদাই সঠিক এবং বিদ'আতীদের ভ্রান্ত ধারণার সুস্পষ্ট খণ্ডন।

(৩) مر ما معنى الاستواء؟ أوضح رأى أهل السنة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى.

"ইস্তিওয়া" শব্দের অর্থ কী? আল্লাহর বাণী "আর-রাহমানু আলাল আরশিস্তাওয়া" (দয়াময় আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন) - এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মতামত স্পষ্ট কর।

উত্তর: "ইস্তিওয়া" শব্দের অর্থ এবং "আর-রাহমানু আলাল আরশিস্তাওয়া" আয়াত সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহর মতামত:

"ইস্তিওয়া" শব্দের অর্থ:

"ইস্তিওয়া" (إِسْتِوَاء) একটি আরবি শব্দ। এর মূলধাতু হলো "সাওয়ুন" (سَوِيَ)। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এর একাধিক অর্থ হতে পারে। আরবি ভাষার ব্যাকরণ ও ব্যবহারের আলোকে "ইস্তিওয়া" শব্দের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হলো:

- উঁচু হওয়া, উপরে ওঠা (ارْتَفَعَ): কোনো কিছুর উপর আরোহণ করা বা উপরে স্থাপন করা।
- স্থির হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া (اِسْتَقَرَّ): কোনো স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করা বা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।
- কর্তৃত্ব স্থাপন করা, আধিপত্য বিস্তার করা (اِسْتَوْلَى): কোনো কিছুর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব লাভ করা।
- সমান হওয়া, সোজা হওয়া (اِسْتَقَامَ): কোনো জিনিস সরল বা সুবিন্যস্ত হওয়া।

তবে, আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে "ইস্তিওয়া" শব্দের অর্থ নির্ধারণের সময় কুরআন ও সুন্নাহর অন্যান্য বর্ণনা এবং সালাফে সালেহীনের ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য।

"আর-রাহমানু আলাল আরশিস্তাওয়া" আয়াত সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহর মতামত:

আল্লাহ তা'আলার বাণী: "الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ" (আর-রাহমান আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন)। এই আয়াতটি কুরআনের সাতটি স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের এই আয়াত এবং আল্লাহর অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীছের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় নীতিমালা রয়েছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের এই আয়াত সম্পর্কে মূলনীতি ও মতামত নিম্নরূপ:

১. আয়াতের উপর ঈমান আনা (الإيمان بالآية): আহলুস সুন্নাহ এই আয়াতের উপর ঈমান আনেন এবং বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ তা'আলা যেভাবে এরশাদ করেছেন তা সত্য। তাঁরা এই আয়াতের কোনো অংশ অস্বীকার করেন না।

২. বাহ্যিক অর্থের উপর বিশ্বাস (إثبات المعنى الظاهر): তাঁরা "ইস্তিওয়া" শব্দের একটি বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করেন যা আল্লাহর শানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে, এই অর্থের স্বরূপ বা ধরণ (কাইফিয়্যাত) আমাদের জ্ঞানের বাইরে।

৩. তা'তীল (تعطيل) বা গুণাবলী অস্বীকার না করা: আহলুস সুন্নাহ মু'আত্তিলাদের মতো আল্লাহর এই গুণকে অস্বীকার করেন না বা রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করেন না যে "ইস্তিওয়া" মানে কেবল কর্তৃত্ব স্থাপন করা। বরং তাঁরা এর একটি প্রকৃত অর্থ আছে বলে বিশ্বাস করেন।

৪. তামসীল (تمثيل) বা সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য স্থাপন না করা: তাঁরা মুশাব্বিহা ও মুজাসসিমাদের মতো আল্লাহর "ইস্তিওয়া"-কে সৃষ্টির আরশের উপর বসার বা স্থির হওয়ার সাথে তুলনা করেন না। আল্লাহর গুণাবলী তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে অতুলনীয়।

৫. তাকয়ীফ (تكييف) বা ধরণ নির্ধারণ না করা: আহলুস সুন্নাহ আল্লাহর "ইস্তিওয়া"-এর ধরণ বা পদ্ধতি বর্ণনা করার চেষ্টা করেন না। কিভাবে আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন, তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। এটা আল্লাহর ইলমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

৬. তাহরীফ (تحريف) বা বিকৃত ব্যাখ্যা না করা: তাঁরা আয়াতের মূল শব্দ বা অর্থের কোনো প্রকার বিকৃতি ঘটান না।

সংক্ষেপে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে, "আর-রাহমান আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন" - এই আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহত্ত্ব ও প্রতাপের সাথে আরশের উপর সমুন্নত ও অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এই অধিষ্ঠান তাঁর শানের উপযুক্ত, যা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। আমরা এর বাহ্যিক অর্থের উপর ঈমান রাখি এবং কোনো প্রকার বিকৃত ব্যাখ্যা, অস্বীকার বা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখি।

ইমাম মালেক (রহ.) কে যখন "ইস্তিওয়া" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন: "الِاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ" (ইস্তিওয়া অর্থ বোধগম্য, কিন্তু এর ধরণ অজ্ঞাত, এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা বিদ'আত)। আহলুস সুন্নাহর এটাই মূলনীতি।

উপসংহার: "ইস্তিওয়া" শব্দের বিভিন্ন অর্থ থাকলেও আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো তাঁর মহত্ত্ব ও প্রতাপের সাথে আরশের উপর সমুন্নত ও অধিষ্ঠিত হওয়া। "আর-রাহমানু আলাল আরশিস্তাওয়া" আয়াত সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সুস্পষ্ট মত হলো এর বাহ্যিক অর্থের উপর ঈমান আনা, কোনো প্রকার অস্বীকার, বিকৃত ব্যাখ্যা বা সৃষ্টির সাথে তুলনা ব্যতীত। এর ধরণ আল্লাহর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং এ বিষয়ে অতিরিক্ত প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এটাই সালাফে সালেহীনের পথ এবং বিশুদ্ধ আকীদা।

(٤) من يمكن رؤية الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة؟ بين مذهب أهل السنة مدللا في هذه المسئلة بالوضاحة.

দুনিয়া ও আখিরাতে কারা আল্লাহকে দেখতে পাবে? এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মাযহাব স্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

উত্তর: দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন:

আল্লাহ তা'আলার দর্শন (রুইয়াতুল্লাহ) ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আকীদাগুলোর অন্যতম। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সুস্পষ্ট ও দলিলভিত্তিক বিশ্বাস রয়েছে।

- **দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার দর্শন:**

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ মতানুসারে, দুনিয়ায় কোনো মানুষ স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে না। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মি'রাজের রাতে আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেননি। এর স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলিল বিদ্যমান:

- **কুরআনের দলিল:**
  - সূরা আল-আন'আমের ১০৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ"

(দৃষ্টিসমূহ তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু তিনি দৃষ্টিসমূহকে উপলব্ধি করতে পারেন। আর তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ।)

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে কোনো দৃষ্টিই আল্লাহকে বেষ্টন করতে বা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়।

  - যখন মুসা (আঃ) আল্লাহকে দেখার জন্য আবেদন করেছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন:

"لَنْ تَرَانِي وَلَٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا"

(সূরা আল-আ'রাফ: ১৪৩)

(তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর যখন তাঁর রব পাহাড়ের উপর জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং মুসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।)

এই ঘটনা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে দুনিয়ায় আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখা সম্ভব নয়। যদি তা সম্ভব হতো, তবে মুসা (আঃ)-এর মতো একজন সম্মানিত নবী তা থেকে বঞ্চিত হতেন না।

- **সুন্নাহর দলিল:**
    - সহীহ মুসলিমে আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ" (আলো! আমি কিভাবে তাঁকে দেখব?) - অন্য বর্ণনায় এসেছে "رَأَيْتُ نُورًا" (আমি আলো দেখেছি)।

এই হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেননি, বরং এক নূর (আলো) দেখেছিলেন যা আল্লাহর আড়ালস্বরূপ ছিল।

- আয়েশা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর দর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে আল্লাহকে দুনিয়ায় কেউ দেখেনি।

সুতরাং, কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস হলো দুনিয়ায় কোনো মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখতে পারবে না।

- **আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন:**

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত বিশ্বাস হলো মুমিনগণ কিয়ামতের দিন জান্নাতে আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। এটি কুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য স্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত।

- **কুরআনের দলিল:**
    - সূরা আল-কিয়ামাহর ২২-২৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ - إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ"

(সেদিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।)

এই আয়াতে "নাযিরাতুন" (তাকিয়ে থাকবে) শব্দটি সুস্পষ্টভাবে আল্লাহকে দেখার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

- সূরা আল-মুতাফফিফীনের ১৫ নং আয়াতে কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ"

(কখনও নয়, সেদিন তারা তাদের রব থেকে আড়ালে থাকবে।)

এই আয়াত থেকে বিপরীতভাবে প্রমাণিত হয় যে মুমিনগণ তাদের রবকে দেখতে পাবেন, কারণ কাফিরদেরকে দেখা থেকে বঞ্চিত করা হবে।

- **সুন্নাহর দলিল:**
    - সহীহ বুখারী ও মুসলিমে জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ

(নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রবকে স্বচক্ষে দেখবে, যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখছ, তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভিড় বা কষ্টের সম্মুখীন হবে না)।"

এই সুস্পষ্ট হাদীস আল্লাহকে দেখার বিষয়টিকে পূর্ণিমার চাঁদ দেখার সাথে তুলনা করেছে, যা সন্দেহাতীতভাবে চাক্ষুষ দর্শনকে প্রমাণ করে।

- সহীহ মুসলিমে সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন: তোমরা কি চাও আমি তোমাদেরকে আরও কিছু দেই? তারা বলবে: হে আমাদের রব! আপনি কি আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? তখন আল্লাহ তা'আলার পর্দা সরানো হবে এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকাবে। আল্লাহর দিকে তাকানোর চেয়ে তাদের কাছে আর কিছুই বেশি প্রিয় ও আনন্দদায়ক হবে না।"

এই সকল স্পষ্ট দলিল থেকে প্রমাণিত হয় যে মুমিনগণ আখিরাতে আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন।

আহলুস সুন্নাহর অবস্থান:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে মুমিনগণ কিয়ামতের দিন জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবেন। এটি জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামতগুলোর মধ্যে অন্যতম হবে। তবে, দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার দর্শন কারো জন্য সম্ভব নয়।

উপসংহার: সংক্ষেপে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস অনুসারে, দুনিয়ায় কোনো মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখতে পারবে না। এর স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিল বিদ্যমান। তবে, আখিরাতে মুমিনগণ জান্নাতে আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। এটি কুরআন ও অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং আহলুস সুন্নাহর সর্বসম্মত আকীদা।

(٥) هل القرآن كلام الله غير مخلوق؟ بين عقيدة أهل السنة في هذه المسئلة.

কুরআন কি আল্লাহর কালাম (কথা), যা মাখলুক (সৃষ্ট) নয়? এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকীদা বর্ণনা কর।

- **কুরআন আল্লাহর কালাম, যা মাখলুক (সৃষ্ট) নয় - এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকীদা:**

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত ও দৃঢ় বিশ্বাস হলো কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম (কথা), যা মাখলুক (সৃষ্ট) নয়। এটি আল্লাহর একটি সিফাতে যাতিয়্যাহ (সত্তা বিষয়ক গুণ) এবং এটি অনাদি ও অনন্ত। কুরআন আল্লাহর ইলম (জ্ঞান) ও ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকীদার মূল বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

১. কুরআন আল্লাহর কালাম: আহলুস সুন্নাহ বিশ্বাস করেন যে কুরআনুল কারীম আল্লাহর নিজস্ব কালাম (কথা)। আল্লাহ তা'আলা এই কালাম জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন। এটি কোনো মানুষের রচিত বা সৃষ্ট নয়।

* কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি বলেছেন যে এটি তাঁর বাণী। যেমন:

"وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ"

(সূরা আত-তাওবাহ: ৬)

(আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়।)

"تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ"

(সূরা আল-বাকারা: ২৫২)

(এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমার কাছে সত্যের সাথে তেলাওয়াত করছি।)

২. কুরআন মাখলুক (সৃষ্ট) নয়: আহলুস সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে কুরআন মাখলুক (সৃষ্ট) নয়। আল্লাহর কালাম তাঁর গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত, আর আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তার মতোই অনাদি ও অনন্ত। কোনো কিছুই আল্লাহর গুণাবলীকে সৃষ্টি করতে পারে না। যদি কুরআনকে মাখলুক বলা হয়, তবে এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর কালাম পূর্বে ছিল না, পরে সৃষ্টি হয়েছে, যা আল্লাহর শানের পরিপন্থী।

* সালাফে সালেহীন এবং আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে কুরআন আল্লাহর কালাম, যা সৃষ্ট নয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সহ বহু আলেম এই আকীদার উপর দৃঢ় ছিলেন এবং এর জন্য নির্যাতনের শিকারও হয়েছেন।

৩. কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে: আহলুস সুন্নাহ বিশ্বাস করেন যে কুরআনের শব্দ (আল-লাফজ) এবং অর্থ (আল-মা'না) উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে। জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর কাছ থেকে এই শব্দ ও অর্থসহ ওহী নিয়ে এসেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এটি কেবল অর্থের ভাব প্রকাশ নয়, বরং এর প্রতিটি শব্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

৪. কুরআন আল্লাহর সিফাতে যাতিয়্যাহ: কুরআন আল্লাহর একটি সিফাতে যাতিয়্যাহ (সত্তা বিষয়ক গুণ)। আল্লাহর এমন কিছু গুণ আছে যা তাঁর সত্তার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত এবং যা কখনো তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না এবং থাকবেও না। কালাম (কথা বলা) আল্লাহর তেমনই একটি গুণ। আল্লাহ সর্বদা কালামের গুণাবলীতে গুণান্বিত।

বিদ'আতীদের খণ্ডন:

কুরআন মাখলুক কি না - এই বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একসময় বড় ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। জাহমিয়া, মু'তাযিলা এবং অন্যান্য কিছু বিদ'আতী গোষ্ঠী এই মতবাদ পোষণ করত যে কুরআন মাখলুক (সৃষ্ট)। তারা কিছু যুক্তির মাধ্যমে তাদের এই ভুল ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ তাদের এই বাতিল মতবাদের জোরালো খণ্ডন করেছেন:

- যদি কুরআনকে মাখলুক বলা হয়, তবে আল্লাহর কালাম হওয়ার পূর্বে আল্লাহ 'কালাম' (কথা) গুণ থেকে মুক্ত ছিলেন, যা আল্লাহর শানের পরিপন্থী। আল্লাহ সর্বদা তাঁর গুণাবলীতে গুণান্বিত।
- কুরআন আল্লাহর ইলম (জ্ঞান)। আল্লাহর ইলম মাখলুক হতে পারে না।

- কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা নূর (আলো) ও হেদায়েত। নূর ও হেদায়েত মাখলুক হতে পারে না।
- সালাফে সালেহীন এবং উম্মাহর অধিকাংশ ইমাম কুরআনকে আল্লাহর কালাম হিসেবে বিশ্বাস করেছেন, যা মাখলুক নয়। তাদের ইজমা (ঐকমত্য) একটি শক্তিশালী শরয়ী দলিল।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অকাট্য বিশ্বাস হলো কুরআনুল কারীম আল্লাহর কালাম, যা মাখলুক (সৃষ্ট) নয়। এটি আল্লাহর একটি শাশ্বত গুণ, যা তাঁর সত্তার মতোই অনাদি ও অনন্ত। যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলে বিশ্বাস করে, সে আহলুস সুন্নাহর আকীদা থেকে বিচ্যুত। প্রত্যেক মুসলিমের উপর এই বিষয়ে সঠিক জ্ঞান রাখা এবং বিশুদ্ধ আকীদার উপর অবিচল থাকা অপরিহার্য।

(٦) هل أفعال العباد مخلوقة الله؟ بين المسئلة مع الرد على مخالفي أهل السنة.

বান্দাদের কর্ম কি আল্লাহর সৃষ্টি? এ বিষয়টি বর্ণনা করুন এবং আহলুস সুন্নাহর বিরোধীদের খণ্ডন কর।

- **বান্দাদের কর্ম কি আল্লাহর সৃষ্টি? এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকীদা ও বিরোধীদের খণ্ডন:**

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট আকীদা হলো বান্দাদের কর্মসমূহ (أفعال العباد) আল্লাহর সৃষ্টি। বান্দারা তাদের কর্মের কর্তা হলেও, তাদের কর্ম সংঘটিত হওয়ার মূল ক্ষমতা ও সৃষ্টি আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকীদার মূল বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

১. আল্লাহ সর্ব কিছুর স্রষ্টা: আহলুস সুন্নাহ বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি আকাশ, পৃথিবী এবং এই দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। বান্দা এবং তাদের কর্মও আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

*** কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:**

"اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ"

আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা আয-যুমার: ৬২)

"وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ"

(সূরা আস-সাফফাত: ৯৬)

(অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা করো তা সৃষ্টি করেছেন।)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে বান্দাদের কর্মও আল্লাহর সৃষ্টি।

২. বান্দাদের ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা: আহলুস সুন্নাহ এও বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে ইচ্ছাশক্তি (إرادة) ও কর্মের ক্ষমতা (قدرة) দান করেছেন। বান্দারা তাদের অর্জিত ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমেই কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের কর্মের জন্য তারা পুরষ্কার বা শাস্তি লাভ করবে।

*** কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:**

"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ"

'আল্লাহ কোনো ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্য এবং সে যা করে তার প্রতিফলও তার উপর বর্তায়'। (সূরা আল-বাকারা: ২৮৬)

এই আয়াতে বান্দার 'অর্জন' (কাসাবাত) ও 'কৃতকর্মের' (ইক্তাসাবাত) কথা বলা হয়েছে, যা প্রমাণ করে বান্দার কর্মের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে।

৩. আল্লাহর সৃষ্টি ও বান্দার কসবের সমন্বয়: আহলুস সুন্নাহ মনে করেন বান্দার কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি এবং বান্দার কসব (অর্জন)-এর সমন্বয়ে সংঘটিত হয়। আল্লাহ বান্দাকে কর্মের ক্ষমতা ও ইচ্ছা দান করেছেন এবং তিনিই সেই কর্মকে বাস্তবে রূপ দেন। বান্দা তার ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা ব্যবহার করে কর্ম সম্পাদন করার চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহর অনুমতি ও সৃষ্টি ছাড়া কোনো কর্ম বাস্তবায়িত হতে পারে না।

* বিষয়টি অনেকটা এমন যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে হাত দিয়েছেন এবং লেখার ক্ষমতা দিয়েছেন। বান্দা যখন লিখতে ইচ্ছা করে এবং হাত ব্যবহার করে, তখন লেখাটি সম্পন্ন হয়। এখানে লেখার মূল ক্ষমতা আল্লাহর দান, কিন্তু লেখার কাজটি বান্দার ইচ্ছাশক্তি ও কর্মের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

- **আহলুস সুন্নাহর বিরোধীদের খণ্ডন:**

এই মাসআলায় আহলুস সুন্নাহর প্রধান বিরোধী হলো কাদারিয়া (القدرية) ও জাবারিয়া (الجبرية) সম্প্রদায়।

- **কাদারিয়া:** কাদারিয়ারা বিশ্বাস করে বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা স্বয়ং। তারা আল্লাহর সর্বব্যাপী ক্ষমতা ও সৃষ্টির কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। তারা মনে করে যদি বান্দার কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি হয়, তবে বান্দাকে তার কর্মের জন্য শাস্তি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত হবে না।

খণ্ডন: কাদারিয়াদের এই মতবাদ কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিরোধী। কুরআনে বহু আয়াতে আল্লাহকে সকল কিছুর স্রষ্টা বলা হয়েছে এবং বান্দাদের কর্মও এর অন্তর্ভুক্ত। বান্দাদেরকে কর্মের জন্য পুরষ্কার বা শাস্তি দেওয়া হয় কারণ আল্লাহ তাদেরকে ইচ্ছাশক্তি ও কর্মের ক্ষমতা দান করেছেন এবং তারা সেই স্বাধীনতা ব্যবহার করে ভালো বা মন্দ কাজ নির্বাচন করে। আল্লাহর সৃষ্টি করার অর্থ এই নয় যে বান্দার কোনো ভূমিকা নেই।

- **জাবারিয়া:** জাবারিয়ারা বিশ্বাস করে বান্দা তার কর্মে সম্পূর্ণরূপে নিরূপায় (মাজবুর)। তাদের কোনো ইচ্ছাশক্তি বা কর্মের ক্ষমতা নেই। বান্দা যা করে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত এবং বান্দা কেবল যন্ত্রস্বরূপ।

❖ **খণ্ডন:** জাবারিয়াদের এই মতবাদও কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী। কুরআনে বান্দাদেরকে তাদের কর্মের জন্য দায়িত্বশীল করা হয়েছে এবং তাদের ভালো কাজের জন্য পুরষ্কার ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যদি বান্দা তার কর্মে নিরূপায় হতো, তবে এই দায়িত্ব ও শাস্তির কোনো অর্থ থাকত না। আল্লাহ বান্দাদেরকে বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন এবং তারা তাদের অর্জিত কর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।

- **আহলুস সুন্নাহর ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান:**

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এই উভয় প্রান্তিকতা পরিহার করে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। তারা বিশ্বাস করে বান্দার কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি, কিন্তু বান্দারও সেই কর্মে অর্জিত ভূমিকা ও ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। বান্দা তার ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা ব্যবহার করে কর্ম সম্পাদন করে এবং তার কর্মের জন্য সে আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবে। আল্লাহর সৃষ্টি করার অর্থ বান্দার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা নয়, বরং আল্লাহর সর্বব্যাপী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে স্বীকার করা।

উপসংহার: সারকথা হলো, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা অনুযায়ী বান্দাদের কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলাই সকল কিছুর স্রষ্টা। তবে, আল্লাহ বান্দাদেরকে ইচ্ছাশক্তি ও কর্মের ক্ষমতা দান করেছেন এবং বান্দারা তাদের অর্জিত কর্মের জন্য পুরষ্কার বা শাস্তি লাভ করবে। কাদারিয়া ও জাবারিয়াদের বিপরীত, আহলুস সুন্নাহর এই ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বাস কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৭) الإيمان وهل هو يزيد وينقص بين المسئلة مع ذكر أقوال العلماء الصالة

ঈমান কি বাড়ে ও কমে? এ বিষয়টি বর্ণনা করুন এবং সৎকর্মশীল আলেমদের মতামত উল্লেখ কর।

- **ঈমান কি বাড়ে ও কমে? এ বিষয়ে সৎকর্মশীল আলেমদের মতামত:**

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত আকীদা হলো ঈমান বাড়ে (يزيد) এবং কমে (ينقص)। ঈমান কেবল মুখের স্বীকৃতি বা অন্তরের বিশ্বাসের নাম নয়, বরং তা কথা, কাজ ও বিশ্বাস - এই তিনটির সমষ্টি। সৎকর্মশীল আলেমগণ কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে এই মত পোষণ করেন।

ঈমান বৃদ্ধির কারণ:

- আল্লাহর পরিচয় ও জ্ঞান বৃদ্ধি: আল্লাহর নাম, গুণাবলী ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়।
- কুরআন তেলাওয়াত ও অনুধাবন: কুরআন তিলাওয়াত করা, এর অর্থ বোঝা এবং এর বিধানের উপর আমল করার মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়।
- যিকির ও দু'আ: আল্লাহর স্মরণ (যিকির) করা এবং তাঁর কাছে দু'আ করার মাধ্যমে অন্তরের সম্পর্ক দৃঢ় হয় এবং ঈমান বাড়ে।
- সৎকর্ম সম্পাদন: সালাত, সাওম, যাকাত, হজ এবং অন্যান্য নেক আমল করার মাধ্যমে ঈমানের বাস্তবায়ন ঘটে এবং ঈমান বৃদ্ধি পায়।
- আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা: আকাশ, পৃথিবী ও প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়।
- সৎসঙ্গ: সৎ ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের সাথে সঙ্গ ঈমানকে শক্তিশালী করে।
- নিয়মিত আত্মসমালোচনা: নিজের ঈমানের দুর্বলতা খুঁজে বের করে তা সংশোধনের চেষ্টা করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়।

ঈমান কমার কারণ:

- আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকা: আল্লাহর যিকির ও ইবাদত থেকে দূরে থাকলে অন্তরের জ্যোতি কমে যায় এবং ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে।
- গুনাহ ও পাপ কাজ: প্রকাশ্যে বা গোপনে গুনাহের কাজ করলে অন্তরের উপর কালিমা পড়ে এবং ঈমান কমতে থাকে।
- কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দূরে থাকা: কুরআন তিলাওয়াত না করা, এর শিক্ষা গ্রহণ না করা এবং সুন্নাহর অনুসরণ না করার কারণে ঈমান হ্রাস পায়।

- দুনিয়ার প্রতি অত্যাধিক আকর্ষণ: দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকলে আখিরাতের চিন্তা কমে যায় এবং ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে।
- কুসঙ্গ: খারাপ ও দ্বীনবিমুখ ব্যক্তিদের সাথে সঙ্গ ঈমানকে দুর্বল করে এবং মন্দ কাজে উৎসাহিত করে।
- অলসতা ও গাফিলতি: ইবাদতে অলসতা করা এবং দ্বীনের বিষয়ে উদাসীন থাকা ঈমান কমার কারণ।
- সন্দেহ ও সংশয়: দ্বীনের মৌলিক বিষয় বা আল্লাহর ওয়াদা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হলে ঈমান দুর্বল হয়ে যায়।

সালাফে সালেহীন আলেমদের মতামত:

সালাফে সালেহীন (সৎকর্মশীল পূর্বসূরী) এবং আহলুস সুন্নাহর অধিকাংশ আলেম এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে ঈমান বাড়ে ও কমে। তাদের কিছু উল্লেখযোগ্য উক্তি ও দলিল নিচে উল্লেখ করা হলো:

- ইমাম বুখারী (রহ.): তিনি তাঁর সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈমানে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন যার শিরোনাম হলো: "ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস"। তিনি এই বিষয়ে বহু সাহাবী ও তাবেঈনের উক্তি উল্লেখ করেছেন।
- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.): তিনি বলেন, "ঈমান হলো কথা ও কাজ। তা বাড়ে এবং কমে।"
- ইমাম শাফিঈ (রহ.): তিনিও ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাসের কথা উল্লেখ করেছেন।
- ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহ.): তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে কুরআন ও সুন্নাহর দলিলের ভিত্তিতে ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাসের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "ঈমান অন্তর ও জিহ্বার স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের নাম। আনুগত্যের মাধ্যমে তা বাড়ে এবং পাপ কাজের মাধ্যমে তা কমে।"
- ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.): তিনিও ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাসের বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন এবং এর বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন।

কুরআন ও সুন্নাহর দলিল:

ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাসের স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহয় বহু দলিল বিদ্যমান:

- **কুরআনের দলিল:**
    - "وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"

(সূরা আল-আনফাল: ২)

(আর যখন তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের রবের উপর ভরসা করে।) - এই আয়াতে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

    - "لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ"

(সূরা আল-ফাতহ: ৪)

(যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি পায়।)

    - দুর্বল ঈমানদারদের প্রসঙ্গে কুরআনে "যায়েফ" (ضعيف) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ঈমান কমার প্রমাণ বহন করে।
- **সুন্নাহর দলিল:**

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ"

(সহীহ মুসলিম: ৪৯)

(তোমাদের মধ্যে যে কোনো মন্দ কাজ দেখবে, সে যেন তা তার হাত দিয়ে পরিবর্তন করে। যদি সে সক্ষম না হয়, তবে তার জিহ্বা দিয়ে। যদি সে তাও সক্ষম না হয়, তবে তার অন্তর দিয়ে, আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর।) - এই হাদীস ঈমানের বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখ করে, যা ঈমান কমা ও বাড়ার প্রমাণ।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন:

"يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ"

(সহীহ বুখারী: ৪৪)

(জাহান্নাম থেকে সেই ব্যক্তিও বের হবে যার অন্তরে এক অনু পরিমাণ ঈমান থাকবে।) - এই হাদীস ঈমানের ক্ষুদ্রতম স্তরের কথা উল্লেখ করে, যা ঈমানের হ্রাসকে ইঙ্গিত করে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ আকীদা হলো ঈমান বাড়ে ও কমে। আনুগত্য ও সৎকর্মের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহ ও অসৎ কাজের মাধ্যমে ঈমান হ্রাস পায়। কুরআন, সুন্নাহ ও সৎকর্মশীল আলেমদের সুস্পষ্ট উক্তি এই মতবাদের সত্যতা প্রমাণ করে। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত ঈমান বৃদ্ধির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা এবং ঈমান হ্রাসকারী বিষয়গুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

(৮) بين حكم مرتكب الكبيرة بضوء مذاهب العلماء مع ترجيح رأي أهل السنة.

কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তির হুকুম আলেমদের বিভিন্ন মাযহাবের আলোকে বর্ণনা করুন এবং আহলুস সুন্নাহর মতের প্রাধান্য দিন।

- **কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তির হুকুম আলেমদের বিভিন্ন মাযহাবের আলোকে এবং আহলুস সুন্নাহর মতের প্রাধান্য:**

কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তির হুকুম একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাহ, যাতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে মতভেদ দেখা গেছে। আলেমদের বিভিন্ন মাযহাবের আলোকে এর বিশ্লেষণ এবং আহলুস সুন্নাহর প্রাধান্যপূর্ণ মতামত নিচে তুলে ধরা হলো:

বিভিন্ন মাযহাবের মতামত:

- **খারেজী (الخوارج):** খারেজীদের মতে, যে ব্যক্তি কবিরা গুনাহ করে সে ইসলাম থেকে খারিজ (বের হয়ে যায়) হয়ে কাফির হয়ে যায় এবং চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে। তাদের মতে ঈমান অবিভাজ্য; এর কোনো অংশ বাদ দিলে পুরোটাই বাতিল হয়ে যায়।
- **মু'তাযিলা (المعتزلة):** মু'তাযিলাদের মতে, কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তি মুমিন থাকে না এবং কাফিরও হয় না; বরং সে ঈমান ও কুফরীর মাঝামাঝি এক স্তরে (منزلة بين المنزلتين - মানযিলাতুন বায়নাল মানযিলাতাইন) অবস্থান করে। তারা আখিরাতে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে।

- **মুরজিয়া (المرجئة):** মুরজিয়াদের বিভিন্ন উপদলের বিভিন্ন মত থাকলেও তাদের মূলনীতি হলো আমল ঈমানের জন্য অপরিহার্য নয়। তাদের মতে, কবিরা গুনাহ ঈমানের সাথে কোনো ক্ষতি করে না। ঈমানের সাথে কোনো গুনাহ ক্ষতিকর নয়, যেমন কুফরীর সাথে কোনো নেকী উপকারী নয়। তাদের মতে, কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তি মুমিন হিসেবেই থাকবে, যদিও সে ফাসিক। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আখিরাতে তার মুক্তির আশা পোষণ করে।
- **আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ (أهل السنة والجماعة):** আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ ও মধ্যপন্থী আকীদা হলো:

১. কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত শিরক (আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন) বা কুফর (ইসলাম অস্বীকার) না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলিম হিসেবেই গণ্য হবে। তাকে কাফির বলা যাবে না।

২. কবিরা গুনাহের কারণে সে ফাসিক (পাপাচারী) ও দুর্বল ঈমানের অধিকারী হবে। তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ মুমিনের মতো নয়।

৩. আখিরাতে তার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন অথবা তার গুনাহের কারণে শাস্তি দিতে পারেন। তবে যদি সে তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) এর উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না। অবশেষে সে আল্লাহর রহমতে বা শাফাআতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৪. কবিরা গুনাহকারীকে দুনিয়াতে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তার উপর ইসলামের বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে (যেমন জানাযা, উত্তরাধিকার ইত্যাদি)। তবে তার গুনাহের কারণে শরীয়তসম্মত শাস্তি (যদি প্রযোজ্য হয়) বাস্তবায়ন করা হবে।

আহলুস সুন্নাহর মতের স্বপক্ষে দলিল:

- **কুরআনের দলিল:**
    - সূরা আল-হুজরাতের ১১-১২ নং আয়াতে মুমিনদের মধ্যে ঝগড়া ও গীবতের মতো কবিরা গুনাহের উল্লেখের পরেও তাদেরকে "মুমিন" হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি কবিরা গুনাহের কারণে তারা কাফির হয়ে যেত, তবে এমন সম্বোধন সঙ্গতিপূর্ণ হতো না।
    - সূরা আন-নিসার ৪৮ ও ১১৬ নং আয়াতে শিরকের গুনাহকে ক্ষমার অযোগ্য বলা হয়েছে, তবে অন্যান্য গুনাহের ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্ষমার অবকাশ রাখা হয়েছে। এর অর্থ হলো কবিরা গুনাহ শিরকের মতো নয় যে তা ঈমানকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবে। **" إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ"** (নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তাছাড়া যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন।)
- **সুন্নাহর দলিল:**
    - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **" مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ"** (যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও সে ব্যভিচারী হোক বা চোর হোক।) - যদিও এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত রয়েছে,

তবে এটি তাওহীদের গুরুত্ব এবং কবিরা গুনাহের কারণে চিরস্থায়ী জাহান্নামী না হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

- শাফাআতের হাদীসসমূহ (যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত) স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে কিয়ামতের দিন গুনাহগার মুমিনদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নেককার বান্দারা সুপারিশ করবেন এবং আল্লাহ তাদের সুপারিশ কবুল করে অনেক গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যদি কবিরা গুনাহকারী কাফির হয়ে যেত, তবে তাদের জন্য শাফাআত প্রযোজ্য হতো না।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "**يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ**" (জাহান্নাম থেকে সেই ব্যক্তিও বের হবে যার অন্তরে এক অনু পরিমাণ ঈমান থাকবে।) - এই হাদীস প্রমাণ করে যে ঈমান থাকা অবস্থায় কবিরা গুনাহ করলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না।

আহলুস সুন্নাহর মতের প্রাধান্য:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতামত কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলিলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং এটি মধ্যপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ। খারেজীদের চরমপন্থী ও মুরজিয়াদের শিথিলতাবাদী উভয় ধারণাই শরীয়তের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

- খারেজীদের মতবাদ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ ও রক্তপাতের কারণ হতে পারে, কারণ তারা সামান্য গুনাহের কারণেও মুসলিমদের কাফির আখ্যায়িত করে।
- মুরজিয়াদের মতবাদ গুনাহের প্রতি উদাসীনতা ও লঘুতা সৃষ্টি করতে পারে, যেহেতু তারা আমলকে ঈমানের অপরিহার্য অংশ মনে করে না।

অন্যদিকে, আহলুস সুন্নাহর মতবাদ গুনাহের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে এবং একই সাথে তাওহীদপন্থী গুনাহগারদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের আশা বজায় রাখে। এটি মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় সহায়ক এবং আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসার ভারসাম্যপূর্ণ ধারণা প্রদান করে।

উপসংহার: কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত শিরক বা কুফরীতে লিপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে সে মুসলিম হিসেবেই গণ্য হবে, তবে ফাসিক ও দুর্বল ঈমানের অধিকারী। আখিরাতে তার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাহর এই মতবাদটি সবচেয়ে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ। অন্যান্য মাযহাবের মতামতগুলো দলিলের দুর্বলতা এবং শরীয়তের সামগ্রিক চেতনার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

(٩) من هم المخاطبون بالإيمان؟ بين حكم قراري المشركين في الآخرة مفصلا.

ঈমানের مخاطب ব (যাদের প্রতি ঈমানের আহ্বান) কারা? আখিরাতে মুশরিকদের পরিণতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

- **ঈমানের مخاطب (যাদের প্রতি ঈমানের আহ্বান) কারা এবং আখিরাতে মুশরিকদের পরিণতি:**

ঈমানের مخاطب (যাদের প্রতি ঈমানের আহ্বান):

ইসলামের মৌলিক আহ্বান - ঈমান আনার আহ্বান - মূলত সকল বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষের প্রতি। যখন কোনো ব্যক্তি দ্বীনের দাওয়াত শ্রবণ করে এবং সত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে, তখন তার উপর ঈমান আনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তবে, বিশেষভাবে কাদের প্রতি এই আহ্বান প্রযোজ্য, তা কয়েকটি দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে:

- **মানব জাতি:** সাধারণভাবে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত সমগ্র মানবজাতির প্রতি ছিল। শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতও বিশ্বব্যাপী এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। যারা এই দাওয়াত শ্রবণ করবে এবং সত্যকে চিনতে পারবে, তাদের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব।
- **প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকবান:** ঈমানের আহ্বানের জন্য ব্যক্তির প্রাপ্তবয়স্ক (বালিগ) ও বিবেকবান (আকিল) হওয়া শর্ত। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু এবং মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি শরীয়তের বিধিবিধান পালনের জন্য প্রাথমিকভাবে আদিষ্ট নয়, যতক্ষণ না তারা এই দুটি যোগ্যতা অর্জন করে। তবে, তাদেরকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দেওয়া এবং ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করা উচিত।
- **যারা দাওয়াত পৌঁছেছে:** যারা ইসলামের দাওয়াত স্পষ্টভাবে ও সঠিকভাবে শুনেছে এবং সত্যকে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছে, তারাই মূলত ঈমানের مخاطب। যাদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছায়নি অথবা বিকৃতভাবে পৌঁছেছে এবং সত্য জানার কোনো সুযোগ পায়নি, তাদের বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তবে, বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগের ব্যাপক প্রসারের যুগে, বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছেই ইসলামের মূল বার্তা কোনো না কোনোভাবে পৌঁছেছে।
- **জিন জাতি:** কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন বর্ণনায় জিন জাতির মধ্যেও নবী প্রেরণের কথা উল্লেখ আছে এবং তারাও ঈমানের مخاطب। অনেক জিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে কুরআন শুনে ঈমান এনেছিল।

সুতরাং, সংক্ষেপে বলা যায়, ঈমানের আহ্বান মূলত সকল প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান নারী-পুরুষের প্রতি, যাদের কাছে ইসলামের সঠিক দাওয়াত পৌঁছেছে এবং যারা তা অনুধাবন করার ক্ষমতা রাখে।

আখিরাতে মুশরিকদের পরিণতি বিস্তারিতভাবে:

আখিরাতে মুশরিকদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ ও চিরস্থায়ী। কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলের মাধ্যমে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। মুশরিক বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, তা সে ইবাদতে হোক, ক্ষমতায় হোক অথবা আল্লাহর গুণাবলীতে হোক। আখিরাতে মুশরিকদের পরিণতি নিম্নরূপ:

১. চিরস্থায়ী জাহান্নাম: মুশরিকরা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। তাদের জন্য কোনো প্রকার ক্ষমা বা মুক্তির আশা নেই।

* কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا"

(সূরা আন-নিসা: ৪৮)

(নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তাছাড়া যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো মহাপাপ রচনা করে।)

"إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ"

(সূরা আল-মায়িদাহ: ৭২)

(নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।)

২. **শাস্তির তীব্রতা ও লাঞ্ছনা:** জাহান্নামে মুশরিকদের শাস্তি হবে অত্যন্ত তীব্র ও বেদনাদায়ক। তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হবে।

* কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ"

(সূরা আর-রা'দ: ৩৪)

(তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর শাস্তি রয়েছে এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই।)

"يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا - هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ"

(সূরা আত-তুর: ১৩-১৪)

(সেদিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। বলা হবে, এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।)

৩. **কোনো সাহায্যকারী বা সুপারিশকারী থাকবে না:** আখিরাতে মুশরিকদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না যে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে এবং তাদের জন্য কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না যার সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন।

* কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ - وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ"

(সূরা আশ-শু'আরা: ১০০-১০১)

(তখন আমাদের কোনো সুপারিশকারী থাকবে না এবং কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুও না।) - এটি জাহান্নামীদের আক্ষেপ।

"مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ"

(সূরা গাফির: ১৮)

(জালেমদের জন্য কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই এবং এমন কোনো সুপারিশকারীও নেই যার সুপারিশ মানা হবে।)

৪. **অনুতাপ ও আক্ষেপ:** মুশরিকরা তাদের কৃতকর্মের জন্য সেদিন অনুতাপ ও আক্ষেপ করবে, কিন্তু তাদের সেই অনুতাপ কোনো কাজে আসবে না। তারা পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে সৎকর্ম করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে, কিন্তু তা আর সম্ভব হবে না।

* কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ ۚ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ"

(সূরা সাবা: ৩১)

(আর যদি তুমি দেখতে যখন জালেমরা তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তাদের একজন আরেকজনের দিকে কথা ফিরিয়ে দেবে। যারা দুর্বল ছিল তারা অহংকারীদের বলবে, যদি তোমরা না থাকতে তবে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।)

৫. **নিরাশ ও হতাশ:** মুশরিকরা আল্লাহর রহমত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়বে। তাদের জন্য কোনো মুক্তির পথ খোলা থাকবে না।

* কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ"

(সূরা আয-যুমার: ৪৭)

(আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য এমন কিছু প্রকাশ হবে যা তারা কখনো ধারণাও করেনি।)

সুতরাং, আখিরাতে মুশরিকদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ ও চিরস্থায়ী। তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত এবং সেখানে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করবে। তাদের কোনো সাহায্যকারী বা সুপারিশকারী থাকবে না এবং তাদের অনুতাপ কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে শিরকের মতো মহাপাপ থেকে রক্ষা কর।

উপসংহার: ঈমানের আহ্বান মূলত সকল প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান মানুষের প্রতি যাদের কাছে ইসলামের সঠিক দাওয়াত পৌঁছেছে। আর আখিরাতে মুশরিকদের পরিণতি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম, যেখানে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। শিরক একটি জঘন্যতম পাপ যা মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয়কেই ধ্বংস করে দেয়। তাই, প্রত্যেক মুসলিমের উচিত শিরক থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাওহীদের উপর দৃঢ় থাকা।

(١٠) هل كرامة الأولياء حق؟ بين أدلة ثبوت الكرامة من القرآن والسنة ؟

আওলিয়াদের কারামত কি সত্য? কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কারামত প্রমাণের দলিল বর্ণনা কর।

- **আওলিয়াদের কারামত কি সত্য? কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কারামত প্রমাণের দলিল:**

জ্বী উত্তর: হ্যাঁ, আওলিয়াদের কারামত (كرامة الأولياء) সত্য। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাসানুসারে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদের (আওলিয়া) মাধ্যমে অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা প্রকাশ করে থাকেন, যা সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এগুলো নবীদের মুজিযা (معجزة) নয়, তবে নবীদের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ এবং আওলিয়াদের মর্যাদা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিদর্শনস্বরূপ এগুলো প্রকাশ পায়।

কারামত প্রমাণের দলিল কুরআন থেকে:

কুরআনে কারীমে আওলিয়াদের কারামতের স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান:

১. মারইয়াম (আঃ)-এর কারামত: সূরা আলে ইমরানের ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মারইয়াম (আঃ)-এর কারামতের বর্ণনা দেন:

"فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ [1]لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ "

(অতঃপর তাঁর রব তাঁকে উত্তমরূপে কবুল করলেন এবং তাঁকে সুন্দরভাবে প্রতিপালন করলেন আর যাকারিয়াকে তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখলেন। যখনই যাকারিয়া তাঁর কাছে মিহরাবে প্রবেশ করতেন, তখনই তিনি তাঁর কাছে খাদ্যসামগ্রী পেতেন। তিনি বলতেন, 'হে মারইয়াম! তোমার জন্য এটা কোথা থেকে?' তিনি বলতেন, 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে চান অপরিমিত জীবিকা দান করেন।') মারইয়াম (আঃ) নবী না হওয়া সত্ত্বেও, আল্লাহর পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক রিজিক লাভ করতেন, যা তাঁর কারামতের স্পষ্ট প্রমাণ।

২. **আসহাবুল কাহাফের কারামত:** সূরা আল-কাহাফে আসহাবুল কাহাফ (গুহাবাসী)-দের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তারা ঈমান রক্ষার জন্য নিজেদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করে একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দীর্ঘকাল (প্রায় ৩০০ বছর) ঘুমন্ত অবস্থায় রেখেছিলেন এবং তাদের দেহ অক্ষত রেখেছিলেন। এটি তাঁদের কারামতের সুস্পষ্ট উদাহরণ। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাদের অস্বাভাবিক ঘুম, পার্শ্ব পরিবর্তন এবং কুকুরের সাথে দীর্ঘকাল অক্ষত থাকার বর্ণনা রয়েছে।

৩. আসীরের কারামত: সূরা আন-নামলের ৩৮-৪০ নং আয়াতে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দরবারে বিলকিসের সিংহাসন আনার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একজন সাধারণ ব্যক্তি (আসীর) চোখের পলকে বহু দূরের সিংহাসন এনে হাজির করেছিলেন, যা নবীর মুজিযা এবং তাঁর সঙ্গীর কারামত উভয়ই হতে পারে। তবে, এটি আওলিয়াদের কারামতের সম্ভাবনার একটি শক্তিশালী ইঙ্গিত বহন করে।

কারামত প্রমাণের দলিল সুন্নাহ থেকে:

সহীহ হাদীসেও আওলিয়াদের কারামতের বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে:

১. উসাইদ ইবনে হুজাইর (রাঃ)-এর কারামত: সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, উসাইদ ইবনে হুজাইর (রাঃ) রাতে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, তখন তাঁর ঘোড়াটি লাফালাফি করতে শুরু করে। তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করলে ঘোড়া শান্ত হয়, আবার শুরু করলে লাফালাফি করে। এক পর্যায়ে তিনি আকাশের দিকে তাকালে এক মেঘখণ্ডের মতো দেখতে পান যাতে প্রদীপের মতো আলো ছিল। সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি বলেন, "ওটা ফেরেশতা ছিল, তোমার কুরআন তেলাওয়াতের কারণে তারা

অবতরণ করেছিল। যদি তুমি তেলাওয়াত করতে থাকতে, তবে তারা সকাল পর্যন্ত সেখানেই থাকত এবং মানুষ তাদেরকে দেখত।" এটি একজন সাহাবীর কারামতের স্পষ্ট প্রমাণ।

২. **সালমান ফারসী (রাঃ) ও আবু দারদা (রাঃ)-এর ঘটনা:** বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, সালমান ফারসী (রাঃ) যখন আবু দারদা (রাঃ)-এর বাড়িতে মেহমান হন, তখন তিনি আবু দারদার স্ত্রী উম্মে দারদাকে অগোছালো অবস্থায় দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উম্মে দারদা বলেন, আবু দারদা দুনিয়ার প্রতি বিমুখ এবং সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকেন। সালমান (রাঃ) আবু দারদাকে ডেকে এনে বলেন, "তোমার রবের তোমার উপর হক আছে, তোমার পরিবারের তোমার উপর হক আছে এবং তোমার নিজেরও তোমার উপর হক আছে। তাই প্রত্যেক হকদারকে তার হক দাও।" এরপর তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলে তিনি সালমানের কথার সমর্থন করেন। এই ঘটনায় সালমান ফারসী (রাঃ)-এর দূরদর্শিতা ও ইলহাম (আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বিশেষ জ্ঞান) তাঁর কারামতের অন্তর্ভুক্ত।

৩. **ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর কারামত:** সহীহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি উচ্চস্বরে বললেন, "ইয়া সারিয়াহ! আল-জাবাল! আল-জাবাল!" (হে সারিয়াহ! পাহাড়! পাহাড়!)। সারিয়াহ (রাঃ) ছিলেন মুসলিম বাহিনীর একজন সেনাপতি যিনি বহু দূরে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। পরে সারিয়াহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে যুদ্ধের সময় হঠাৎ তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পান যা তাকে পাহাড়ের দিকে সরে যেতে নির্দেশ করে এবং এর ফলে মুসলিম বাহিনী শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। এটি ওমর (রাঃ)-এর কাশফ (অদৃশ্য বিষয় দেখা বা জানতে পারা) কারামতের স্পষ্ট উদাহরণ। এগুলো ছাড়াও সাহাবী ও তাবেঈনদের জীবনে অসংখ্য কারামতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা আহলুস সুন্নাহর নিকট নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত।

কারামত ও মুজিযার মধ্যে পার্থক্য:

- **মুজিযা (معجزة):** মুজিযা হলো নবীদের মাধ্যমে প্রকাশিত অস্বাভাবিক ঘটনা যা নবুওয়তের প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা দান করেন এবং যা নবুওয়তের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সংঘটিত হয়।
- **কারামত (كرامة):** কারামত হলো আওলিয়া (আল্লাহর নেক বান্দা)-দের মাধ্যমে প্রকাশিত অস্বাভাবিক ঘটনা যা তাদের ঈমান, তাকওয়া ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা দান করেন এবং যা নবুওয়তের সত্যতাকে আরও দৃঢ় করে।

উপসংহার:

কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলিল এবং নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে আওলিয়াদের কারামত সত্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদেরকে সম্মানিত করার জন্য এবং দ্বীনের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা তাদের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। তবে, কারামত কখনোই নবীদের মুজিযার সমতুল্য নয় এবং কারামত প্রদর্শনের ক্ষমতা আওলিয়াদের নিজস্ব অর্জন নয়, বরং এটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দান। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এই বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন এবং কারামতকে সত্য বলে স্বীকার করেন।

(١١) عرف الإسراء والمعراج؟ هل المعراج كان في المنام أم في اليقظة مع الروح والجسدة بين رأي أهل السنة مدللا
ইসরা ও মি'রাজের সংজ্ঞা দিন। মি'রাজ কি স্বপ্নে হয়েছিল নাকি জাগ্রত অবস্থায় রুহ ও দেহ উভয়সহ? দলিলের মাধ্যমে আহলুস সুন্নাহর মতামত বর্ণনা কর।

- **ইসরা ও মি'রাজের সংজ্ঞা এবং জাগ্রত অবস্থায় রুহ ও দেহসহ মি'রাজের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মতামত:**

ইসরা (الإسراء) এর সংজ্ঞা:

ইসরা (الإسراء) আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো রাত্রিকালীন ভ্রমণ করানো। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, ইসরা বলতে বোঝায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা মুকাররমা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেম)-এর দিকে রাতের বেলা যে অলৌকিক ভ্রমণ করানো হয়েছিল। এই ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখ কুরআনের সূরা আল-ইসরায় (বনী ইসরাঈল)-এর প্রথম আয়াতে রয়েছে:

"سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"

(পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, যেন আমি তাঁকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।)

মি'রাজ (المعراج) এর সংজ্ঞা:

মি'রাজ (المعراج) আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো ঊর্ধ্বগমন বা সিঁড়ি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মি'রাজ বলতে বোঝায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ঊর্ধ্বলোকে (আসমানসমূহে) যে অলৌকিক ভ্রমণ করানো হয়েছিল এবং যেখানে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে।

মি'রাজ কি স্বপ্নে হয়েছিল নাকি জাগ্রত অবস্থায় রুহ ও দেহ উভয়সহ? আহলুস সুন্নাহর মতামত:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত ও দৃঢ় বিশ্বাস হলো মি'রাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের **জাগ্রত অবস্থায় রুহ (আত্মা) ও দেহ (শরীর) উভয়সহ** সংঘটিত হয়েছিল। এটি কোনো স্বপ্ন বা কেবল রুহের ভ্রমণ ছিল না।

আহলুস সুন্নাহর মতের স্বপক্ষে দলিল:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন স্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে এই মত পোষণ করেন:

১. কুরআনের আয়াত: সূরা আল-ইসরায় ব্যবহৃত শব্দ "**أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ**" (তাঁর বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছেন) দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ সত্তা - রুহ ও দেহ উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। যদি এটি কেবল স্বপ্ন বা রুহের ভ্রমণ হতো, তবে "**বি-রুহিহি**" (তাঁর রুহকে) অথবা "**ফি মানামিহি**" (তাঁর স্বপ্নে) - এমন শব্দ ব্যবহার করা হতো। "**আবদ**" শব্দটি একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ সত্তাকে নির্দেশ করে।

২. **হাদীসে মি'রাজের বিস্তারিত বিবরণ:** সহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে মি'রাজের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বোরাকে আরোহণ করা, বায়তুল মুকাদ্দাসে নবীদের সাথে সালাত আদায় করা, এরপর জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে এক এক করে সাত আসমান ভেদ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছানো, জান্নাত ও জাহান্নাম দেখা এবং আল্লাহর সাথে কথোপকথনের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। এই সকল ঘটনা দৈহিক উপস্থিতি ছাড়া কেবল স্বপ্নে বা রুহের মাধ্যমে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়।

* উদাহরণস্বরূপ, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে মি'রাজের বিস্তারিত ঘটনা উল্লেখ আছে, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তিনি বোরাকে চড়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে যান, সেখানে নবীদের সাথে সালাত আদায় করেন, এরপর জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে নিয়ে প্রথম আকাশে যান, তারপর একে একে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছান এবং আল্লাহর সাথে কথা বলেন। এই বর্ণনায় দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার অভিজ্ঞতার উল্লেখ রয়েছে।

৩. **সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বাস:** অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বিশ্বাস করতেন যে মি'রাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাগ্রত অবস্থায় রুহ ও দেহ উভয়সহ হয়েছিল। এই বিষয়ে তাদের মধ্যে সামান্য কিছু দ্বিমত থাকলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এটাই ছিল।

৪. **ঘটনার অস্বাভাবিকতা:** মি'রাজ একটি অলৌকিক ঘটনা, যা আল্লাহর অসীম ক্ষমতা দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যেমন অন্য নবীদেরকে মুজিজা দান করেছেন, তেমনি তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এই বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। জাগ্রত অবস্থায় রুহ ও দেহসহ এই ভ্রমণ আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে নয়। যদি এটি কেবল স্বপ্ন হতো, তবে এতে বিস্ময়ের কিছু থাকত না, কারণ মানুষ স্বপ্নে অনেক অস্বাভাবিক জিনিস দেখতে পারে। কুরআনের আয়াতের প্রেক্ষাপট এবং হাদীছের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে এটি একটি অসাধারণ ও বাস্তব ঘটনা ছিল।

৫. **বিরোধীদের প্রতিক্রিয়া:** যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের ঘটনা মক্কার কুরাইশদের কাছে বর্ণনা করেন, তখন তারা এটিকে চরমভাবে অবিশ্বাস করে এবং উপহাস করে। তারা যদি মনে করত যে এটি কেবল একটি স্বপ্ন ছিল, তবে তাদের প্রতিক্রিয়া এত তীব্র হতো না। তাদের অবিশ্বাস এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃঢ় বক্তব্য প্রমাণ করে যে এটি একটি বাস্তব ঘটনা ছিল যা জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল।

যারা ভিন্নমত পোষণ করেন:

কিছু দুর্বল বর্ণনার ভিত্তিতে অথবা রূপক ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে কেউ কেউ মনে করেন মি'রাজ কেবল স্বপ্নে অথবা কেবল রুহের ভ্রমণ ছিল। তবে, আহলুস সুন্নাহর নির্ভরযোগ্য আলেমগণ শক্তিশালী দলিল ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে এই মতকে প্রত্যাখ্যান করেন।

উপসংহার:

সারকথা হলো, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস হলো ইসরা ও মি'রাজ উভয়ই সত্য এবং মি'রাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাগ্রত অবস্থায় রুহ ও দেহ উভয়সহ সংঘটিত হয়েছিল। কুরআন, সহীহ হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এই আকীদার অকাট্য প্রমাণ বহন

করে। এটি আল্লাহর অসীম ক্ষমতার একটি নিদর্শন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের বহিঃপ্রকাশ।

(১৭) لى هل الجنة والنار مخلوقتان الآن وهل هما تغنيان أم تبيدان بين مدلل

জান্নাত ও জাহান্নাম কি বর্তমানে সৃষ্ট? এবং এ দুটি কি শেষ হয়ে যাবে নাকি চিরস্থায়ী থাকবে? দলিলের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

জান্নাত ও জাহান্নাম কি বর্তমানে সৃষ্ট এবং এ দুটি কি শেষ হয়ে যাবে নাকি চিরস্থায়ী থাকবে? দলিলের মাধ্যমে বর্ণনা:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত আকীদা হলো জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ তা'আলা বর্তমানে সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং এ দুটি কখনোই ধ্বংস বা শেষ হবে না; বরং চিরস্থায়ী থাকবে।

জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট হওয়ার দলিল:

কুরআন ও সুন্নাহর বহু আয়াতে ও হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান:

- **কুরআনের দলিল:**
  - সূরা আলে ইমরানের ১৩৩ নং আয়াতে মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রাখার কথা বলা হয়েছে: **"وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ"** (আর তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও যার প্রশস্ততা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।) এখানে **"أُعِدَّتْ"** (প্রস্তুত রাখা হয়েছে) শব্দটি অতীতকালবাচক, যা প্রমাণ করে জান্নাত বর্তমানে বিদ্যমান।
  - সূরা আল-বাকারার ২৪ নং আয়াতে কাফিরদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রাখার কথা বলা হয়েছে: **"فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ"** (অতএব যদি তোমরা তা না কর এবং তোমরা কখনো তা করতে পারবেও না, তাহলে তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।) এখানেও **"أُعِدَّتْ"** (প্রস্তুত রাখা হয়েছে) শব্দটি অতীতকালবাচক, যা জাহান্নামের বর্তমান অস্তিত্বের প্রমাণ।
  - মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন বলে সহীহ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে (যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিম)। যদি এগুলো তখন সৃষ্টি না হয়ে থাকত, তবে তিনি কিভাবে তা দেখতে পেলেন?
- **সুন্নাহর দলিল:**
  - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **" إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَقَدْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"** (যখন তোমাদের কেউ মারা যায়, তখন সকাল-সন্ধ্যা তার

ঠিকানা তাকে দেখানো হয়। যদি সে জান্নাতবাসী হয় তবে জান্নাতের ঠিকানা, আর যদি সে জাহান্নামবাসী হয় তবে জাহান্নামের ঠিকানা। তাকে বলা হয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে উত্থিত করা পর্যন্ত এটাই তোমার ঠিকানা।) এই হাদীস থেকে বোঝা যায় মৃত্যুর পরপরই মানুষের জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের ঠিকানা নির্ধারিত থাকে, যা তাদের বর্তমান অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: **" اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ مِنْ سَمُومِ جَهَنَّمَ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمَ "** (জাহান্নাম তার রবের কাছে অভিযোগ করে বলল, হে আমার রব! আমার এক অংশ অন্য অংশকে খাচ্ছে। তখন আল্লাহ তাকে দুটি শ্বাস ফেলার অনুমতি দিলেন - একটি শীতকালে এবং একটি গ্রীষ্মকালে। সুতরাং তোমরা গ্রীষ্মকালে যে তীব্র গরম অনুভব করো তা জাহান্নামের বিষাক্ত শ্বাস এবং তোমরা শীতকালে যে তীব্র ঠান্ডা অনুভব করো তা জাহান্নামের কনকনে ঠান্ডা।) এই হাদীস জাহান্নামের বর্তমান কার্যকলাপের বর্ণনা দেয়।

জান্নাত ও জাহান্নামের চিরস্থায়ীত্বের দলিল:

কুরআন ও সুন্নাহয় বহু স্পষ্ট আয়াত ও হাদীস রয়েছে যা প্রমাণ করে জান্নাত ও জাহান্নাম কখনোই ধ্বংস হবে না; বরং অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান থাকবে:

- **কুরআনের দলিল:**
  - জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন: **"خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا"** (তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।) (সূরা আল-বাকারা: ২৫, সূরা আন-নিসা: ৫৭, ১২২, সূরা আল-মায়িদাহ: ৮৫, ১১৯, ইত্যাদি বহু আয়াতে এই কথা বলা হয়েছে।)
  - জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন: **" خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ "** (তারা সেখানে স্থায়ী হবে যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, তবে তোমার রব যা চান তা ভিন্ন। নিশ্চয়ই তোমার রব যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।) (সূরা হুদ: ১০৭) এই আয়াতে "যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে" - এই বাক্যটি চিরস্থায়ীত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিছু বিদ্বান "তবে তোমার রব যা চান তা ভিন্ন" - এই অংশের বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এটি নির্দিষ্ট কিছু কাফির বা গুনাহগারদের জন্য প্রযোজ্য যারা শাস্তি ভোগের পর মুক্তি পাবে (তবে মুশরিকদের জন্য নয়), অথবা এটি আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপকতা বোঝায়, কিন্তু জান্নাত ও জাহান্নামের মূল নীতি চিরস্থায়ী।
  - অন্যত্র জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: **"وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا"** (এবং তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না।) (সূরা আল-বাকারা: ১৬৭, সূরা আল-মায়িদাহ: ৩৭)
- **সুন্নাহর দলিল:**
  - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **" يُؤْتَى بِالْمَوْتِ فِي صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُنَادَى يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ وَيُنَادَى يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادَى يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ "** (কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে

একটি সাদা-কালো মেশানো ভেড়ার আকৃতিতে আনা হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে দাঁড় করানো হবে। তারপর ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসী! তারা উঁকি মেরে দেখবে। তারপর ঘোষণা করা হবে, হে জাহান্নামবাসী! তারাও উঁকি মেরে দেখবে। তারপর ভেড়াটিকে জবাই করা হবে। এরপর ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসী! তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী জীবন, আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসী! তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি, আর মৃত্যু নেই।) এই সহীহ হাদীস স্পষ্টভাবে জান্নাত ও জাহান্নামের চিরস্থায়ীত্বের কথা ঘোষণা করে।

যারা ভিন্নমত পোষণ করেন:

কিছু দুর্বল মতবাদ বা দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে কেউ কেউ জান্নাত ও জাহান্নামের ধ্বংসের কথা বলেছেন, তবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কাছে এসব মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয় এবং কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলের বিরোধী।

উপসংহার:

সারকথা হলো, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ ও অকাট্য বিশ্বাস হলো জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ তা'আলা বর্তমানে সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং এ দুটি কখনোই ধ্বংস বা শেষ হবে না; বরং অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান থাকবে। কুরআন ও সহীহ হাদীছের অসংখ্য স্পষ্ট দলিল এই আকীদার সত্যতা প্রমাণ করে। মুসলিম উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম এই বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

(١٣) ما هي أصول الإيمان التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها؟

ঈমানের সেই মূলনীতিগুলো কী কী, যা প্রত্যেক মুসলিমের উপর বিশ্বাস করা ওয়াজিব?

- **ঈমানের সেই মূলনীতিগুলো কী কী, যা প্রত্যেক মুসলিমের উপর বিশ্বাস করা ওয়াজিব?**

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ঈমানের যে মূলনীতিগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব, সেগুলো সংক্ষেপে "ঈমানের স্তম্ভ" (أركان الإيمان) নামে পরিচিত। হাদীসে জিবরীলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্তম্ভগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হলো ছয়টি:

১. **আল্লাহর উপর ঈমান (الإيمان بالله):** আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করা। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও নিয়ন্ত্রক। তাঁর সুন্দর নামসমূহ ও পরিপূর্ণ গুণাবলী রয়েছে, যা কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে। এই বিশ্বাসে আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী ও কর্মে একত্ববাদ অন্তর্ভুক্ত।

২. **ফেরেশতাদের উপর ঈমান (الإيمان بالملائكة):** ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। তারা আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি, নূর থেকে তৈরি, আল্লাহর আদেশ পালনকারী এবং তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। যেমন: জিবরাঈল (আঃ) ওহী নিয়ে আসেন, মীকাঈল (আঃ) বৃষ্টি ও রিযিকের দায়িত্বে নিয়োজিত, ইসরাফীল (আঃ) শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন ইত্যাদি।

৩. **আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর ঈমান (الإيمان بالكتب):** আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য যে সকল কিতাব (গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছেন সেগুলোর উপর বিশ্বাস করা। যেমন: তাওরাত (মুসা আঃ-এর উপর), যাবূর (দাউদ আঃ-এর উপর), ইঞ্জিল (ঈসা আঃ-এর উপর) এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআনুল কারীম (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর)। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মূল শিক্ষা সত্য হলেও

বর্তমানে সেগুলো বিকৃত হয়ে গেছে। কুরআন সর্বশেষ ও অপরিবর্তিত আসমানী গ্রন্থ, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক।

৪. **রাসূলগণের উপর ঈমান (الإيمان بالرسل):** আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন - এই বিশ্বাস রাখা। তাদের মধ্যে প্রথম আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সকল নবী-রাসূল সত্যবাদী ছিলেন এবং আল্লাহর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাদের প্রতি সম্মান জানানো এবং বিশেষভাবে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব।

৫. **আখিরাতের উপর ঈমান (الإيمان باليوم الآخر):** মৃত্যুর পরবর্তী জীবন অর্থাৎ আখিরাতের উপর বিশ্বাস করা। এই বিশ্বাসে কবর, কিয়ামত, হাশর (বিচার দিবস), জান্নাত (স্বর্গ), জাহান্নাম (নরক), হিসাব-নিকাশ, পুরষ্কার ও শাস্তি - এই সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। এই বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্ম করতে উৎসাহিত করে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।

৬. **তাকদীরের উপর ঈমান (الإيمان بالقدر خيره وشره):** তাকদীর অর্থাৎ ভাগ্যের ভালো ও মন্দের উপর বিশ্বাস করা। এই বিশ্বাসে আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন এবং লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন - এই জ্ঞান রাখা এবং যা কিছু ঘটে তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটে - এই বিশ্বাস স্থাপন করা অন্তর্ভুক্ত। তবে এর অর্থ এই নয় যে মানুষের কোনো স্বাধীনতা নেই; বরং আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন এবং তাদের কর্মের জন্য তারা দায়ী থাকবে। তাকদীরের উপর বিশ্বাস আল্লাহর জ্ঞানের পূর্ণতা ও ক্ষমতার পরিচায়ক।

এই ছয়টি মূলনীতি প্রত্যেক মুসলিমের উপর বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এর কোনো একটি অস্বীকার করলে ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না। এই স্তম্ভগুলো ইসলামের মৌলিক ভিত্তি এবং এগুলোর উপরই একজন মুসলিমের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত।

(١٤) ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ وما هي شروطها؟

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই) এবং "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" (মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল) - এই সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ কী? এবং এর শর্তগুলো কী কী?

- **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই) এবং "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" (মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল) - এই সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ কী? এবং এর শর্তগুলো কী কী?**

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ) - এই সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ:

এই কালিমা তাইয়্যিবা (পবিত্র বাক্য) ইসলামের মূল ভিত্তি। এর অর্থ হলো:

- **নফী (نفي):** "লা ইলাহা" (لَا إِلَٰهَ) - কোনো ইলাহ নেই। এর মাধ্যমে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল উপাস্যকে অস্বীকার করা হয়। পাথর, মূর্তি, মানুষ, জিন, ফেরেশতা, নক্ষত্র বা অন্য কোনো সৃষ্টি - কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়।

- **ইসবাৎ (إثبات):** "ইল্লাল্লাহ" (إِلَّا اللَّهُ) - আল্লাহ ব্যতীত। এর মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে সত্য ইলাহ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য, তাঁর কোনো শরীক নেই।

সুতরাং, এই সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হলো আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করা যে আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সত্য উপাস্য। তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই এবং ইবাদতের সকল প্রকার হক একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) - এই সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ:

এই সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হলো আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করা যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল (প্রেরিত)। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। এই সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো:

- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল - এই বিশ্বাস রাখা।
- তিনি যা আদেশ করেছেন তা মেনে চলা।
- তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।
- তিনি যেভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছেন সেভাবে ইবাদত করা।
- তাঁর প্রতি ভালোবাসা রাখা এবং তাঁর সম্মান করা।
- বিশ্বাস করা যে তাঁর আনীত শরীয়ত সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ শরীয়ত এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য অনুসরণীয়।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ও "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" - এই উভয় সাক্ষ্যের শর্তসমূহ:

এই উভয় সাক্ষ্য কবুল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, যা একজন সাক্ষ্যদানকারীকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে। আলেমগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এই শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন। উল্লেখযোগ্য শর্তগুলো হলো:

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর শর্তসমূহ:

১. **ইলম (العلم) - জ্ঞান:** এই কালিমার অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখা। কেবল মুখস্ত করলে বা না বুঝে উচ্চারণ করলে যথেষ্ট নয়।

২. **ইয়াকীন (اليقين) - দৃঢ় বিশ্বাস:** এই কালিমার অর্থের প্রতি কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ না করে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

৩. **ইখলাস (الإخلاص) - একনিষ্ঠতা:** সকল প্রকার শিরক থেকে অন্তরকে মুক্ত রেখে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই সাক্ষ্য দেওয়া।

৪. **সিদক (الصدق) - সত্যবাদিতা:** অন্তরের বিশ্বাসের সাথে মুখের কথার সত্যতা থাকা। কেবল লোক দেখানো বা ভয়ে উচ্চারণ করলে তা যথেষ্ট নয়।

৫. **মুহাব্বাহ (المحبة) - ভালোবাসা:** এই কালিমার প্রতি এবং এর অর্থের প্রতি ভালোবাসা রাখা এবং যারা এর উপর আমল করে তাদেরকে ভালোবাসা।

৬. **ইনকিয়াদ (الانقياد) - আত্মসমর্পণ:** আল্লাহর বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

৭. **কবুল (القبول) - কবুল করা:** অহংকার বা বিদ্বেষবশত এই কালিমাকে প্রত্যাখ্যান না করে সানন্দে গ্রহণ করা।

৮. **কুফর বিততাগুত (الكفر بالطاغوت) - তাগুতকে অস্বীকার করা:** আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল উপাস্য ও শরীককে অস্বীকার করা এবং তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা।

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এর শর্তসমূহ:

১. **ইলম (العلم) - জ্ঞান:** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয়, তাঁর রিসালাত ও তাঁর আনীত শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা।

২. **তাসদীক (التصديق) - সত্য বলে বিশ্বাস করা:** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা সবই সত্য বলে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা।

৩. **তাতবী' (التَّتَبُّع) - অনুসরণ করা:** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর সুন্নত অনুযায়ী জীবনযাপন করা।

৪. **মুহাব্বাহ (المحبة) - ভালোবাসা:** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর পর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা।

৫. **ইখলাস (الإخلاص) - একনিষ্ঠতা:** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা।

৬. **দা'ওয়াত ইলাইহি (الدعوة إليه) - তাঁর দিকে আহ্বান করা:** সাধ্যানুযায়ী অন্যদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথে আহ্বান করা।

এই শর্তগুলো পূরণ করার মাধ্যমেই একজন ব্যক্তির শাহাদা (সাক্ষ্য) আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং এর মাধ্যমেই সে ইসলামের গন্ডিতে প্রবেশ করে। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই উভয় সাক্ষ্যের হক আদায় করার তাওফিক দান কর।

(١٥) ما هو القضاء والقدر؟ وكيف يجمع المسلم بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين فعل الأسباب؟

ক্বাযা ও ক্বদর কী? এবং একজন মুসলিম কিভাবে ক্বাযা ও ক্বদরের উপর ঈমান আনা এবং উপায় অবলম্বনের মধ্যে সমন্বয় করবে?

- **ক্বাযা ও ক্বদর কী? এবং একজন মুসলিম কিভাবে ক্বাযা ও ক্বদরের উপর ঈমান আনা এবং উপায় অবলম্বনের মধ্যে সমন্বয় করবে?**

ক্বাযা (القضاء) ও ক্বদর (القدر) এর অর্থ:

ইসলামী শরীয়তে ক্বাযা (القضاء) ও ক্বদর (القدر) তাকদীরের সাথে সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। যদিও এই দুটি শব্দ প্রায়শই একে অপরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তবে আলেমগণ এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য উল্লেখ করেছেন:

- **ক্বদর (القدر):** ক্বদর হলো আল্লাহ তা'আলার পূর্বজ্ঞান ও নির্ধারণ। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির পূর্বে সকল কিছুর ইলম (জ্ঞান) রাখেন এবং তিনি তাঁর ইলম অনুযায়ী সবকিছু লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন - কখন কী ঘটবে, কার রিযিক কতটুকু হবে, কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে - সবকিছু তিনি জানেন এবং তাঁর লওহে মাহফুজে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখে রেখেছেন। এটি আল্লাহর শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় জ্ঞান ও ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।
- **ক্বাযা (القضاء):** ক্বাযা হলো আল্লাহর সেই পূর্বনির্ধারিত বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন বা কার্যকর করা। যখন আল্লাহর ইলম ও নির্ধারণ অনুযায়ী কোনো কিছু বাস্তবে সংঘটিত হয়, তখন তাকে ক্বাযা বলা হয়। ক্বাযা মূলত ক্বদরের বাস্তব রূপায়ণ।

সহজভাবে বললে, ক্বদর হলো আল্লাহর পরিকল্পনা আর ক্বাযা হলো সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

ক্বাযা ও ক্বদরের উপর ঈমান আনা এবং উপায় অবলম্বনের মধ্যে সমন্বয়:

একজন মুসলিমের জন্য ক্বাযা ও ক্বদরের উপর ঈমান আনা ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের অন্যতম। এর অর্থ হলো এই বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন এবং তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন। তবে এর সাথে উপায় অবলম্বন (فعل الأسباب) করার কোনো বিরোধ নেই। একজন মুসলিম কিভাবে এই দুটির মধ্যে সমন্বয় করবে, তা নিম্নরূপ:

১. ক্বাযা ও ক্বদরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা: একজন মুসলিমকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে যা কিছু ঘটে, আল্লাহর জ্ঞান ও পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী ঘটে। ভালো-মন্দ যা কিছু তার জীবনে আসে, সবই আল্লাহর ফয়সালা। এই বিশ্বাস তাকে ধৈর্য ধারণ করতে, বিপদে হতাশ না হতে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করতে শেখায়।

২. উপায় অবলম্বন করা (فعل الأسباب): ইসলাম উপায় অবলম্বনের প্রতি উৎসাহিত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উপায় অবলম্বন করেছেন এবং উম্মতকে এর শিক্ষা দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করানো, রিজিকের জন্য হালাল পথে চেষ্টা করা, বিপদ থেকে রক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা - এগুলো সবই উপায় অবলম্বনের অন্তর্ভুক্ত।

* কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ"

(সূরা আল-জুমু'আ: ১০)

(যখন সালাত সমাপ্ত হয়, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) তালাশ কর।)

এই আয়াতে সালাতের পর রিযিক অনুসন্ধানের উপায় অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: " الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ"

(সহীহ মুসলিম: ২৬৬৪)

(শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে আল্লাহর কাছে উত্তম ও প্রিয়। তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। যা তোমার জন্য উপকারী তার প্রতি আগ্রহী হও, আল্লাহর সাহায্য চাও এবং অলসতা করো না।)

এই হাদীসে উপকারী কাজের জন্য চেষ্টা করতে এবং আল্লাহর সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে, যা উপায় অবলম্বনের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

৩. **উপায় অবলম্বনের উপর ভরসা না করা, আল্লাহর উপর ভরসা করা:** একজন মুসলিম উপায় অবলম্বন করবে, তবে তার উপর সম্পূর্ণরূপে ভরসা করবে না। তার মূল ভরসা থাকবে আল্লাহর উপর। কারণ উপায় অবলম্বন কেবল একটি মাধ্যম, ফল দানকারী একমাত্র আল্লাহ। যদি আল্লাহ না চান, তবে কোনো উপায়ই কাজে আসবে না।

৪. **ফলাফলের উপর সন্তুষ্ট থাকা:** উপায় অবলম্বনের পর যে ফলাফল আসে, তা আল্লাহর ফয়সালা হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যদি কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়া যায়, তবে হতাশ না হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে এর মধ্যেই কোনো কল্যাণ নিহিত আছে।

৫. **অলসতা পরিহার করা:** ক্বাযা ও ক্বদরের উপর ঈমান আনার অর্থ এই নয় যে মানুষ কর্ম ত্যাগ করে অলসভাবে বসে থাকবে এবং বলবে যা ভাগ্যে আছে তাই হবে। বরং ইসলাম অলসতাকে ঘৃণা করে এবং কর্মঠ জীবন যাপনে উৎসাহিত করে। তাকদীরের বিশ্বাস মানুষকে চেষ্টা ও পরিশ্রম থেকে বিরত থাকার কোনো অজুহাত দেয় না।

সংক্ষেপে, একজন মুসলিম ক্বাযা ও ক্বদরের উপর ঈমান আনবে এই বিশ্বাসে যে সবকিছু আল্লাহর পূর্বনির্ধারণ অনুযায়ী হয়। একই সাথে সে তার সাধ্য অনুযায়ী হালাল পথে উপায় অবলম্বন করবে এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে। সফলতা বা ব্যর্থতা যাই আসুক না কেন, সে আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং কখনো হতাশ হবে না। এটাই ক্বাযা ও ক্বদরের উপর ঈমান আনা এবং উপায় অবলম্বনের মধ্যে সঠিক সমন্বয়।

(١٦) من هم الرسل؟ وما هي وظيفتهم؟ وما هي أوصافهم التي يجب الإيمان بها؟

রাসূলগণ কারা? তাঁদের দায়িত্ব কী? এবং তাঁদের সেই গুণাবলীগুলো কী কী, যার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব?

- **রাসূলগণ কারা? তাঁদের দায়িত্ব কী? এবং তাঁদের সেই গুণাবলীগুলো কী কী, যার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব?**

রাসূলগণ কারা?

রাসূল (رسول) আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো প্রেরিত ব্যক্তি বা বার্তাবাহক। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, রাসূলগণ হলেন সেই সম্মানিত মানবগণ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের নিকট রিসালাতের (বার্তার) দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তারা আল্লাহর মনোনীত, পবিত্র ও নিষ্পাপ। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেন এবং সেই ওহী মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। সকল রাসূলই পুরুষ ছিলেন এবং তারা সকলেই আল্লাহর বান্দা ও সৃষ্টি, তাদের মধ্যে কোনো প্রকার ঐশ্বরিকতা নেই।

তাঁদের দায়িত্ব কী?

রাসূলগণের প্রধান দায়িত্ব হলো:

১. **আল্লাহর তাওহীদের দাওয়াত:** মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা এবং শিরক (আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন) থেকে নিষেধ করা। সকল রাসূলের মূল দাওয়াত ছিল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই)।

২. **আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া:** আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওহী তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে ও পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দেওয়া। তারা আল্লাহর বাণীর কোনো অংশ গোপন করেননি বা পরিবর্তন করেননি।

3. **শরীয়তের বিধিবিধান শিক্ষা দেওয়া:** আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম এবং জীবন যাপনের নিয়মকানুন মানুষের কাছে শিক্ষা দেওয়া এবং তা বাস্তবায়ন করে দেখানো।
4. **সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ:** মানুষকে সৎ ও কল্যাণকর কাজ করার আদেশ দেওয়া এবং অন্যায় ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করা।
5. **আখিরাতের ভয় ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া:** আল্লাহর আনুগত্যকারীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ এবং অবাধ্যদের জন্য জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির কথা জানানো।
6. **ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:** সমাজে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসা করা।
7. **উত্তম আদর্শ স্থাপন:** রাসূলগণ ছিলেন তাদের উম্মতের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তারা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।

তাঁদের সেই গুণাবলীগুলো কী কী, যার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব?

রাসূলগণের কিছু আবশ্যিক গুণাবলী রয়েছে, যেগুলোর উপর ঈমান আনা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব। এই গুণাবলীগুলো তাঁদের রিসালাতের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে প্রমাণ করে:

১. **সিদক (الصدق) - সত্যবাদিতা:** সকল রাসূল ছিলেন সত্যবাদী। তারা কখনো কোনো বিষয়ে মিথ্যা বলেননি। তারা যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে এনেছেন, সবই সত্য।

২. **আমানত (الأمانة) - আমানতদারিতা:** রাসূলগণ ছিলেন পরম আমানতদার। তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তাঁরা পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করেছেন এবং আল্লাহর বাণী যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কোনো প্রকার খেয়ানত তাঁরা করেননি।

3. **তাবলীগ (التبليغ) - প্রচার:** রাসূলগণ তাঁদের উপর অবতীর্ণ আল্লাহর বাণী স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রচার করেছেন। তাঁরা কোনো প্রকার ভয় বা দ্বিধা ছাড়াই আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।
4. **ফাতানাহ (الفطانة) - প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা:** রাসূলগণ ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। তাঁরা তাঁদের দাওয়াতের পদ্ধতি এবং মানুষের মন জয় করার কৌশল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখতেন।
5. **ইসমা (العصمة) - নিষ্পাপতা:** রাসূলগণ বড় ধরনের গুনাহ (কবিরা গুনাহ) থেকে সুরক্ষিত ছিলেন। নবুওয়তের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থেকে আল্লাহ তাঁদেরকে রক্ষা করেছেন। ছোটখাটো ভুল (সাঘিরা গুনাহ) যদি কখনো তাঁদের থেকে সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদেরকে সংশোধন করে দিয়েছেন।

এছাড়াও, রাসূলগণ সর্বোত্তম চরিত্র, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দয়ালুতা ও সহানুভূতিসহ সকল উত্তম গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাঁদের জীবন ছিল মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

প্রত্যেক মুসলিমের উপর বিশ্বাস করা ওয়াজিব যে রাসূলগণ আল্লাহর মনোনীত এবং তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। তাদের আনুগত্য করা আল্লাহর আনুগত্য করার শামিল এবং তাদের বিরোধিতা করা আল্লাহর বিরোধিতার শামিল। বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা এবং তাঁর অনুসরণ করা সকল যুগের মানুষের জন্য অপরিহার্য।

(١٧) ما هي الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى؟ وما هي مكانة القرآن الكريم بينها؟

আল্লাহ তা'আলা যে আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন সেগুলো কী কী? এবং সেগুলোর মধ্যে কুরআনুল কারীমের মর্যাদা কী?

- **আল্লাহ তা'আলা যে আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন সেগুলো কী কী? এবং সেগুলোর মধ্যে কুরআনুল কারীমের মর্যাদা কী?**

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে বহু নবী-রাসূলের উপর আসমানী কিতাব ও সহীফা (ছোট পুস্তিকা) নাযিল করেছেন। কুরআনে কারীমে বিশেষভাবে চারটি প্রধান আসমানী কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে:

১. **তাওরাত (التوراة):** এটি মুসা (আঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল। এটি বনী ইসরাঈলের (ইসরাঈলের বংশধর) জন্য হেদায়াত ও আলোর উৎস ছিল। কুরআনে এর অনেক বিধিবিধান ও উপদেশ উল্লেখ রয়েছে।

২. **যাবূর (الزبور):** এটি দাউদ (আঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল। এটিতে বিভিন্ন উপদেশ, নীতিগর্ভ কথা ও আল্লাহর প্রশংসামূলক স্তুতি (সালাম) বিদ্যমান ছিল।

৩. **ইঞ্জিল (الإنجيل):** এটি ঈসা (আঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল। এটি তাওরাতের বিধিবিধানকে সমর্থন করত এবং মানুষের জন্য সরল পথের দিশা দিত। এতে ঈসা (আঃ)-এর উপদেশ, মুজিযা ও ভবিষ্যৎ বাণী উল্লেখ ছিল।

৪. **কুরআনুল কারীম (القرآن الكريم):** এটি সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে। এটি পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সার নির্যাস এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান।

এছাড়াও, কুরআনে ইবরাহীম (আঃ) ও মুসা (আঃ)-এর সহীফার (ছোট পুস্তিকা) কথাও উল্লেখ আছে। তবে, এই চারটি প্রধান কিতাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআনুল কারীমের মর্যাদা:

কুরআনুল কারীমের মর্যাদা অন্যান্য আসমানী কিতাবের তুলনায় অনেক ঊর্ধ্বে। এর প্রধান কারণগুলো হলো:

১. **সর্বশেষ আসমানী কিতাব:** কুরআন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এর পরে আর কোনো কিতাব নাযিল হবে না এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী।

২. **পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক:** কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের মূল শিক্ষাকে সত্যায়ন করে এবং সেগুলোর মধ্যে যে পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটেছে তা স্পষ্ট করে। আল্লাহ তা'আলা নিজেই এই কিতাবের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: **"إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"** (সূরা আল-হিজর: ৯) (নিশ্চয়ই আমিই এই উপদেশ (কুরআন) নাযিল করেছি এবং নিশ্চয়ই আমিই এর সংরক্ষক।) অতএব, কুরআন তার মূল রূপে কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত থাকবে।

৩. **সর্বজনীন ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান:** কুরআন কোনো বিশেষ জাতি বা সময়ের জন্য নাযিল হয়নি; বরং এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে মানুষের জীবনের সকল দিক - বিশ্বাস, ইবাদত, নৈতিকতা, সামাজিক আচার-আচরণ, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

4. **মুজিযা ও অলৌকিকতা:** কুরআন নিজেই একটি জীবন্ত মুজিযা। এর ভাষা, সাহিত্যশৈলী, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং ভবিষ্যৎ বাণী - সবকিছুই অলৌকিক। চৌদ্দ শতাব্দীর অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও এর মতো একটি আয়াতও রচনা করতে কেউ সক্ষম হয়নি এবং পারবেও না।
5. **সকল আসমানী কিতাবের সার নির্যাস:** কুরআন পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের মূল শিক্ষা ও সার নির্যাস ধারণ করে। এতে তাওহীদ (একত্ববাদ), রিসালাত (নবী-রাসূলগণের উপর বিশ্বাস), আখিরাত (পরকালের বিশ্বাস) - এই মৌলিক বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।
6. **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ:** কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর রিসালাতকে চিরস্থায়ী করেছেন।

সুতরাং, কুরআনুল কারীম কেবল একটি আসমানী কিতাবই নয়, বরং এটি সকল আসমানী কিতাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ, অপরিবর্তনীয় এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য হেদায়াতের একমাত্র পথ। প্রত্যেক মুসলিমের উপর

এই কিতাবের প্রতি ঈমান আনা, এর তিলাওয়াত করা, এর অর্থ বোঝা এবং এর শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করা অপরিহার্য।

(١٨) من هم الملائكة؟ وما هي وظائفهم التي كلفهم الله بها؟

ফেরেশতাগণ কারা? এবং আল্লাহ তাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেগুলো কী কী?

- **ফেরেশতাগণ কারা? এবং আল্লাহ তাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেগুলো কী কী?**

ফেরেশতাগণ কারা?

ফেরেশতাগণ (الْمَلَائِكَةُ) আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। তারা নূর (আলো) থেকে সৃষ্ট, পবিত্র ও নিষ্পাপ। তারা আল্লাহর আদেশ পালনে সর্বদা নিয়োজিত এবং তাদের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। ফেরেশতাগণ পানাহার করেন না, ক্লান্তি অনুভব করেন না এবং আল্লাহর ইবাদতে কখনো অলসতা করেন না। তাদের সংখ্যা অগণিত এবং তাদের আকার ও ক্ষমতা আল্লাহই ভালো জানেন।

কুরআন ও সুন্নাহয় ফেরেশতাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে:

- **নূর থেকে সৃষ্টি:** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ফেরেশতাগণ নূর থেকে সৃষ্টি হয়েছেন, জিন জাতি আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং আদম (আঃ) মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছেন।" (সহীহ মুসলিম: ২৯৯৬)
- **অদৃশ্য:** ফেরেশতাগণ সাধারণত মানুষের চোখে অদৃশ্য থাকেন, তবে আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো সময় কোনো কোনো নবী বা নেক বান্দার কাছে বিশেষ রূপে তাদের দর্শন দান করেছেন।
- **অগণিত সংখ্যা:** তাদের সংখ্যা এত বেশি যে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা জানে না।
- **বিভিন্ন আকার ধারণের ক্ষমতা:** আল্লাহ তা'আলার হুকুমে ফেরেশতাগণ বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারেন, যেমন মানুষের রূপে জিবরাঈল (আঃ) ﷺবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিলেন।
- **পুরুষত্ব বা নারীত্ব নেই:** ফেরেশতাগণ পুরুষ বা নারী নন। যারা তাদেরকে নারী বলে বিশ্বাস করে, তাদের ধারণা ভুল।
- **আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য:** তারা সর্বদা আল্লাহর আদেশ মেনে চলেন এবং কখনো তাঁর হুকুম অমান্য করেন না। কুরআনে বলা হয়েছে: **"لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ"** (তারা আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তাতে অবাধ্য হন না এবং তারা তাই করেন যা তাদেরকে আদেশ করা হয়)। (সূরা আত-তাহরীম: ৬)

আল্লাহ তাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন সেগুলো কী কী?

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন। তাদের কিছু প্রধান দায়িত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো:

- **ওহী বহন:** জিবরাঈল (আঃ) প্রধানত আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণের কাছে ওহী (আল্লাহর বাণী) নিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সকল নবীর কাছে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।

- **বৃষ্টি বর্ষণ ও রিযিক বণ্টন:** মীকাঈল (আঃ) বৃষ্টি বর্ষণ এবং আল্লাহর হুকুমে জীবজন্তু ও মানুষের রিযিক বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত।
- **আত্মা কবজ:** মালাকুল মাউত (মৃত্যুর ফেরেশতা) ও তার সহকারী ফেরেশতাগণ মানুষের রুহ কবজ করার দায়িত্ব পালন করেন।
- **শিঙ্গায় ফুঁৎকার:** ইসরাফীল (আঃ) কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদেশে শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেবেন, যার মাধ্যমে মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে এবং এরপর পুনরায় ফুঁৎকার দিলে সকল মানুষ জীবিত হয়ে উঠবে।
- **আমলনামা সংরক্ষণ:** কিরমান কাতিবীন নামক ফেরেশতাগণ প্রত্যেক মানুষের ভালো ও মন্দ কাজসমূহ লিখে রাখেন, যা কিয়ামতের দিন হিসাবের জন্য পেশ করা হবে।
- **কবর আজাব ও শান্তির ফেরেশতা:** কবরে মুনকার ও নাকীর নামক ফেরেশতাগণ মৃত ব্যক্তিকে তার ঈমান ও আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং মুমিনদের জন্য শান্তি ও কাফিরদের জন্য আজাবের ব্যবস্থা করবেন।
- **জান্নাত ও জাহান্নামের তত্ত্বাবধান:** রিদওয়ান (আঃ) জান্নাতের তত্ত্বাবধানে এবং মালেক (আঃ) জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ফেরেশতাগণের প্রধান।
- **আরশ বহনকারী ফেরেশতা:** কিছু শক্তিশালী ফেরেশতা আল্লাহর আরশ বহন করার দায়িত্ব পালন করেন।
- **আল্লাহর প্রশংসায় নিয়োজিত ফেরেশতা:** অসংখ্য ফেরেশতা সর্বদা আল্লাহর তাসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) ও তাহমীদ (প্রশংসা বর্ণনা) পাঠে নিয়োজিত থাকেন।
- **মানুষের হেফাজত:** কিছু ফেরেশতা আল্লাহর হুকুমে মানুষকে বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেন।
- **মুমিনদের জন্য দু'আ:** কিছু ফেরেশতা মুমিনদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত কামনা করে দু'আ করেন।

ফেরেশতাদের দায়িত্বের তালিকা ব্যাপক ও বিস্তৃত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা সেই কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করে যাচ্ছেন। তাদের প্রতি ঈমান আনা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অংশ।

(١٩) ما هو اليوم الآخر؟ وما هي المراحل التي يمر بها الإنسان بعد الموت؟

ইয়াওমুল আখির (শেষ দিবস) কী? এবং মৃত্যুর পর মানুষ যে পর্যায়গুলোর মধ্য দিয়ে যাবে সেগুলো কী কী?

- **ইয়াওমুল আখির (শেষ দিবস) কী? এবং মৃত্যুর পর মানুষ যে পর্যায়গুলোর মধ্য দিয়ে যাবে সেগুলো কী কী?**

ইয়াওমুল আখির (اليوم الآخر) কী?

ইয়াওমুল আখির (শেষ দিবস) হলো ইসলামী পরিভাষায় সেই দিন, যেদিন এই বর্তমান বিশ্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং আল্লাহ তা'আলা সকল মৃত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন এবং সেই

অনুযায়ী জান্নাত (স্বর্গ) অথবা জাহান্নামে (নরক) তাদের চূড়ান্ত স্থান নির্ধারণ করবেন। এই দিনের শুরু হবে ইসরাফীল (আঃ)-এর শিঙ্গায় প্রথম ফুঁৎকারের মাধ্যমে, যখন এই মহাবিশ্বের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর দ্বিতীয় ফুঁৎকারের মাধ্যমে সকল মানুষ তাদের কবর থেকে উত্থিত হবে এবং আল্লাহর সামনে বিচারের জন্য সমবেত হবে।

ইয়াওমুল আখিরের উপর ঈমান আনা ইসলামের ছয়টি স্তম্ভের অন্যতম। একজন মুসলিমের জন্য এই দিনের বাস্তবতা, ভয়াবহতা এবং আল্লাহর ন্যায়বিচার সম্পর্কে বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।

▪ মৃত্যুর পর মানুষ যে পর্যায়গুলোর মধ্য দিয়ে যাবে সেগুলো:

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এবং তারপর অনন্তকাল পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাবে। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় নিচে উল্লেখ করা হলো:

- **মৃত্যু (الموت):** এটি হলো দুনিয়াবী জীবনের সমাপ্তি এবং আখিরাতের জীবনের প্রথম ধাপ। মৃত্যুর সময় মানুষের রুহ (আত্মা) তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। সৎকর্মশীলদের রুহ শান্তভাবে বের করা হয় এবং অসৎকর্মশীলদের রুহ কঠিনভাবে টেনে বের করা হয়।
- **কবর (القبر) বা বারযাখ (البرزخ):** মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের আত্মা যে অবস্থায় থাকে, তাকে বারযাখ বলা হয়। কবর হলো এই বারযাখের একটি অংশ। এই সময়ে মৃত ব্যক্তি তার ভালো ও মন্দ কাজের ফল কিছুটা অনুভব করতে শুরু করে।
- **কবরের ফিতনা (فتنة القبر) ও শাস্তি/শান্তি:** কবরে মুনকার ও নাকীর নামক দুইজন ফেরেশতা মৃত ব্যক্তিকে তার রব, তার দ্বীন এবং তার নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। যারা ঈমানের সাথে সঠিক উত্তর দিতে পারবে, তাদের কবর প্রশস্ত ও আলোকিত করে দেওয়া হবে এবং তারা শান্তিতে থাকবে। আর যারা উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে, তাদের জন্য কবরের আজাব (শাস্তি) শুরু হবে এবং তাদের কবর সংকীর্ণ ও অন্ধকার করে দেওয়া হবে।
- **কিয়ামতের পূর্বে কিছু আলামত (علامات الساعة):** কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বে ছোট ও বড় কিছু আলামত (চিহ্ন) প্রকাশ পাবে। ছোট আলামতগুলোর মধ্যে রয়েছে জ্ঞান হ্রাস, মূর্খতা বৃদ্ধি, ব্যভিচার ও মদ্যপান ব্যাপক হওয়া ইত্যাদি। বড় আলামতগুলোর মধ্যে রয়েছে দাজ্জালের আগমন, ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া ইত্যাদি।
- **কিয়ামত (القيامة) বা পুনরুত্থান (البعث):** ইসরাফীল (আঃ)-এর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁৎকারের মাধ্যমে সকল মৃত মানুষ তাদের কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত হবে। এই দিনটি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে এবং মানুষ তাদের কৃতকর্মের ফল সম্পর্কে চিন্তিত থাকবে।
- **হাশর (الحشر) বা সমবেত হওয়া:** পুনরুত্থিত হওয়ার পর সকল মানুষ একটি বিশাল ময়দানে (মাশআর) আল্লাহর সামনে বিচারের জন্য সমবেত হবে। এই দিনে সূর্য মাথার কাছে চলে আসবে এবং মানুষেরা তাদের পাপের কারণে প্রচণ্ড গরমে কষ্ট পেতে থাকবে।

- **আমলনামা পেশ ও হিসাব-নিকাশ (عرض الأعمال والحساب):** এই দিনে প্রত্যেক মানুষের জীবনের সকল ভালো ও মন্দ কাজ তাদের আমলনামায় (কর্মের খাতায়) লিপিবদ্ধ অবস্থায় পেশ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা সকলের কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেবেন।
- **মিযান (الميزان) বা ওজন:** মানুষের ভালো ও মন্দ কাজ ওজন করার জন্য একটি বিশেষ পাল্লা স্থাপন করা হবে। যাদের সৎকর্মের ওজন বেশি হবে, তারা সফল হবে এবং যাদের অসৎকর্মের ওজন বেশি হবে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- **সিরাত (الصراط):** এটি জাহান্নামের উপর স্থাপিত একটি সরু সেতু, যা অতিক্রম করে মুমিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে। কাফির ও পাপীরা এই সেতু পার হতে পারবে না এবং তারা জাহান্নামে পতিত হবে।
- **শাফা'আত (الشفاعة) বা সুপারিশ:** আল্লাহ তা'আলার অনুমতিতে নবীগণ, ফেরেশতাগণ এবং নেককার বান্দাগণ পাপী মুমিনদের জন্য সুপারিশ করবেন, যার ফলে তাদের শাস্তি লাঘব হতে পারে অথবা তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে।
- **জান্নাত (الجنة) ও জাহান্নাম (النار):** হিসাব-নিকাশ ও অন্যান্য পর্যায় শেষে মুমিনগণ তাদের ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ করবে, যেখানে তারা অনন্তকাল সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। আর কাফির ও পাপিষ্ঠরা তাদের কুফর ও পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, যেখানে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

এই পর্যায়গুলো মৃত্যুর পর মানুষের জন্য নির্ধারিত এবং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এইগুলোর উপর বিশ্বাস রাখা এবং আখিরাতের জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। আল্লাহ আমাদের সকলকে আখিরাতের কঠিন হিসাব থেকে রক্ষা করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউস দান কর।

(٢٠) ما هو تعريف العبادة في الإسلام؟ وما هي أنواعها؟

ইসলামে ইবাদতের সংজ্ঞা কী? এবং এর প্রকারভেদগুলো কী কী?

- **ইসলামে ইবাদতের সংজ্ঞা কী? এবং এর প্রকারভেদগুলো কী কী?**

ইসলামে ইবাদতের সংজ্ঞা:

ইসলামে ইবাদতের (العبادة) ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থ রয়েছে। সাধারণভাবে, ইবাদত বলতে বোঝায় আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত ভালোবাসা, ভয় ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা। আলেমগণ ইবাদতের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়েছেন:

"الْعِبَادَةُ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ"

অর্থাৎ, "ইবাদত হলো এমন একটি ব্যাপক নাম যা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক সকল প্রকার কথা, কাজ ও অভ্যন্তরীণ অনুভূতির সমষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করে, তা বাহ্যিক হোক বা অভ্যন্তরীণ।"

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, ইবাদত শুধু কিছু নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং জীবনের প্রতিটি দিক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হলেই তা ইবাদতে পরিণত হতে পারে।

ইবাদতের প্রকারভেদ:

ইসলামে ইবাদতকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

১. **বাহ্যিক ইবাদত (العبادات الظاهرة):** এই প্রকার ইবাদত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং তা দৃশ্যমান। এর কিছু উদাহরণ হলো:

- সালাত (الصلاة): নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা। এটি ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলোর অন্যতম।
- যাকাত (الزكاة): নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ নির্দিষ্ট হারে অভাবী ও হকদারদের মাঝে বিতরণ করা। এটি ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ এবং একটি আর্থিক ইবাদত।
- সিয়াম (الصيام): আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রমজান মাসে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা। এটি ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ এবং একটি শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ইবাদত।
- হজ্জ (الحج): সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়ে মক্কায় বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও সংশ্লিষ্ট আমলসমূহ সম্পাদন করা। এটি ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ এবং একটি শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত।
- জিহাদ (الجهاد): আল্লাহর পথে নিজের জান ও মাল দিয়ে চেষ্টা করা। এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে, যেমন শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া।
- সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر): সমাজে ভালো কাজের প্রচার করা এবং খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা।
- দান-সদকা (الصدقة): আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সম্পদ থেকে দান করা। এটি ঐচ্ছিক ইবাদত হলেও এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে।
- শারীরিক শ্রম (العمل الحلال): হালাল পথে জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে করা হয়।

২. **অভ্যন্তরীণ ইবাদত (العبادات الباطنة):** এই প্রকার ইবাদত মানুষের অন্তর ও অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত এবং তা অদৃশ্য। এর কিছু উদাহরণ হলো:

- ঈমান (الإيمان): আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত ও তাকদীরের উপর আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি সকল ইবাদতের মূল ভিত্তি।
- ইখলাস (الإخلاص): সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা এবং লোক দেখানো বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা।
- তাওয়াক্কুল (التوكل): সকল বিষয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল হওয়া।
- খাশইয়াত (الخشية) ও খওফ (الخوف): আল্লাহর ভয় রাখা এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করা।
- রাজা (الرجاء): আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা রাখা।

- মুহাব্বাহ (المحبة): আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা এবং তাঁর রাসূল ও দ্বীনকে ভালোবাসা।
- শুকর (الشكر): আল্লাহর সকল নেয়ামতের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, যা অন্তর, মুখ ও কর্মের মাধ্যমে হতে পারে।
- সবর (الصبر): আল্লাহর পথে কষ্ট ও পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করা।
- তাওবা (التوبة): কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে তা না করার দৃঢ় সংকল্প করা।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থায় এই বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার ইবাদতের সমন্বয় অপরিহার্য। একজন মুসলিমের জীবন আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত।

(٢١) ما هي السنة النبوية؟ وما هي حجيتها في الشريعة الإسلامية؟

সুন্নাতে নববী কী? এবং ইসলামী শরীয়তে এর প্রামাণিকতা কতটুকু?

- **সুন্নাতে নববী কী? এবং ইসলামী শরীয়তে এর প্রামাণিকতা কতটুকু?**

সুন্নাতে নববী (السنة النبوية) কী?

সুন্নাতে নববী (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ) বলতে বোঝায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা (قول), কাজ (فعل) এবং মৌন সম্মতি (تقرير)। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, সুন্নাহ হলো কুরআনুল কারীমের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যা দ্বীনের বিধিবিধান, বিশ্বাস ও নৈতিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

- **কাওল (قول):** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত বাণী, যা হাদীস নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা, আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।
- **ফেল (فعل):** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সম্পাদিত কার্যাবলী। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁর প্রতিটি কাজ মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং পরবর্তীতে তা বর্ণনা করেছেন।
- **তাকরীর (تقرير):** সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কোনো কথা বললে বা কোনো কাজ করলে তিনি যদি নীরব থাকতেন অথবা তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করতেন, তবে সেটিও সুন্নাহ হিসেবে গণ্য হয়। এর অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কথা বা কাজের বিরোধিতা করেননি।

ইসলামী শরীয়তে সুন্নাতে নববীর প্রামাণিকতা (حجية السنة النبوية):

ইসলামী শরীয়তে সুন্নাতে নববীর প্রামাণিকতা কুরআনুল কারীমের মতোই অত্যাবশ্যকীয় এবং তা দ্বীনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর প্রামাণিকতার স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর বহু সুস্পষ্ট দলিল বিদ্যমান:

১. কুরআনের দলিল:

* আল্লাহ তা'আলা কুরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন বহুবার। যেমন:

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"

(সূরা আন-নিসা: ৫৯)

(হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের মধ্যকার কর্তৃত্বশীলদেরও। অতঃপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে মতবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও - যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটাই উত্তম এবং পরিণতির দিক থেকেও উৎকৃষ্ট।)

এই আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যকে সমান্তরালভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মতবিরোধের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন মানে তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করা।

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

" وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"

(সূরা আল-হাশর: ৭)

(রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।)

এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ ও নিষেধ মানা ওয়াজিব করা হয়েছে, যা সুন্নাহর প্রামাণিকতার স্পষ্ট প্রমাণ।

* আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকে তাঁরই আনুগত্য হিসেবে গণ্য করেছেন:

" مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا"

(সূরা আন-নিসা: ৮০)

(যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি।)

২. সুন্নাহর দলিল:

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করার গুরুত্বের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন:

" تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي"

(মুয়াত্তা মালিক)

(আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না - আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং আমার সুন্নাহ।)

এই হাদীসে কুরআন ও সুন্নাহ উভয়কেই পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সুন্নাহর প্রামাণিকতাকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন:

"أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ"

(আবু দাউদ)

(জেনে রাখো! নিশ্চয়ই আমাকে কিতাব (কুরআন) এবং তার সাথে অনুরূপ (সুন্নাহ) প্রদান করা হয়েছে।)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে সুন্নাহ কুরআনের মতোই প্রামাণিক এবং তা শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

* সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং তা অনুসরণ করতেন। তারা কোনো বিষয়ে কুরআনে স্পষ্ট বিধান না পেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন।

অতএব, ইসলামী শরীয়তে সুন্নাতে নববীর প্রামাণিকতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এবং তা কুরআনুল কারীমের পরেই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ উভয়কেই অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর অপরিহার্য। যারা সুন্নাহকে অস্বীকার করে অথবা তার প্রামাণিকতাকে কম গুরুত্ব দেয়, তারা মূলত ইসলামী শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভকে অস্বীকার করে।

(٢٢) ما هو الإجماع؟ وما هي منزلته كمصدر من مصادر التشريع في الإسلام؟

ইজমা' (ঐক্যমত) কী? এবং ইসলামে শরীয়তের উৎস হিসেবে এর মর্যাদা কী?

- **ইজমা' (الإجماع) কী? এবং ইসলামে শরীয়তের উৎস হিসেবে এর মর্যাদা কী?**

ইজমা' (الإجماع) কী?

আভিধানিক অর্থে ইজমা' (الإجماع) মানে হলো কোনো বিষয়ে একমত হওয়া, দৃঢ় সংকল্প করা অথবা কোনো কাজের উপর ঐকমত্য পোষণ করা।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, ইজমা' (الإجماع) বলা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মুজতাহিদ (ইসলামী আইনবিদ)গণের কোনো শরঈ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর কোনো নির্দিষ্ট যুগে উম্মতের সকল মুজতাহিদ কোনো দ্বীনি মাসআলার উপর একমত হলে, তাকে ইজমা' বলা হয়।

ইজমা' সংঘটিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী বিদ্যমান:

- ঐকমত্য পোষণকারীগণ অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- ঐকমত্য পোষণকারীগণ ঐ যুগের মুজতাহিদ হতে হবে, অর্থাৎ যারা কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞান রাখেন এবং ইজতিহাদ (শরঈ বিষয়ে গবেষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা) অর্জনের শর্তাবলী পূরণ করেন। সাধারণ মানুষ বা মুকাল্লিদদের (যারা অন্যের তাকলীদ করেন) ঐকমত্য শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।
- ঐকমত্যটি কোনো শরঈ বিষয়ে হতে হবে, যা দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাস, ইবাদত, লেনদেন, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কিত হতে পারে।
- ঐকমত্যটি সুস্পষ্টভাবে অথবা নীরব সম্মতির মাধ্যমে হতে পারে। সুস্পষ্ট ঐকমত্য হলো যখন সকল মুজতাহিদ কোনো বিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন। নীরব সম্মতি হলো যখন কোনো মুজতাহিদের মতামত অন্য মুজতাহিদগণের নিকট পৌঁছানোর পর তারা নীরব থাকেন এবং কোনো বিরোধিতা না করেন।

ইসলামে শরীয়তের উৎস হিসেবে ইজমা'র মর্যাদা:

ইসলামী শরীয়তে ইজমা' কুরআন ও সুন্নাহর পর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। এর মর্যাদা ও প্রামাণিকতা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

১. কুরআনের দলিল:

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

" وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا"

(সূরা আল-বাকারা: ১৪৩)

(আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন।)

এই আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকে মধ্যপন্থী ও সাক্ষী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উম্মতের ঐকমত্য যদি ভ্রান্ত হয়, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং, উম্মতের ইজমা' সত্য ও সঠিক হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

" وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا"

(সূরা আন-নিসা: ১১৫)

(আর যে ব্যক্তি তার কাছে হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথের অনুসরণ করে, আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেব যেদিকে সে ফিরেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা কতই না মন্দ ঠিকানা।)

এই আয়াতে মুমিনদের পথের বিরোধিতাকে জাহান্নামের পথে যাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মুমিনদের ঐকমত্য (ইজমা') যেহেতু তাদের সম্মিলিত পথ, তাই এর বিরোধিতা করা অনুচিত।

২. সুন্নাহর দলিল:

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ"

(সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯৫২)

(আমার উম্মত কখনো ভ্রান্তির উপর একমত হবে না।)

এই হাদীসটি ইজমা'র প্রামাণিকতার সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে তাঁর উম্মত সম্মিলিতভাবে কোনো ভুল সিদ্ধান্তের উপর উপনীত হবে না।

* অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

" سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا"

(সহীহ মুসলিম: ২৮৮৯)

(আমি আমার রবের কাছে তিনটি বিষয় চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে দুটি দান করেছেন এবং একটি দেননি। আমি আমার রবের কাছে চেয়েছিলাম যেন তিনি আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন, তিনি তা মঞ্জুর করেছেন। আমি তাঁর কাছে চেয়েছিলাম যেন তিনি আমার উম্মতকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন, তিনি তা মঞ্জুর করেছেন। আর আমি তাঁর কাছে চেয়েছিলাম যেন তিনি তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত সৃষ্টি না করেন, কিন্তু তিনি তা দেননি।)

প্রথম দুটি দোয়ার কবুলিয়াত থেকে বোঝা যায় যে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের উপর বিশেষ অনুগ্রহ রেখেছেন এবং তাদের সামগ্রিক ধ্বংস থেকে রক্ষা করবেন। ইজমা' যেহেতু উম্মতের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত, তাই তা ভ্রান্ত হতে পারে না।

ইজমা' ইসলামী শরীয়তের একটি শক্তিশালী উৎস। কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার অভাবে অথবা নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শরঈ বিধান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইজমা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইজমা'র মাধ্যমে ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকে এবং উম্মত বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পায়। কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয়ে ইজমা' গ্রহণযোগ্য নয়, বরং ইজমা' অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে হতে হবে।

(٢٣) ما هو القياس؟ وهل يعتبر مصدراً مستقلاً للتشريع؟

কিয়াস (সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ) কী? এবং এটি কি শরীয়তের একটি স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়?

কিয়াস (القياس) কী? এবং এটি কি শরীয়তের একটি স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়?

কিয়াস (القياس) কী?

আভিধানিক অর্থে কিয়াস (القياس) মানে হলো কোনো কিছুর সাথে অন্য কিছুর তুলনা করা, অনুমান করা বা সাদৃশ্য স্থাপন করা।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, কিয়াস (القياس) হলো কুরআন ও সুন্নাহর কোনো সুস্পষ্ট বিধানের (নস) ভিত্তিতে একই কারণ বিদ্যমান থাকার সাপেক্ষে একটি নতুন মাসআলার শরঈ হুকুম নির্ধারণ করা। সহজভাবে বলতে গেলে, কিয়াস হলো দুটি জিনিসের মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একটির হুকুম অন্যটির উপর প্রয়োগ করা। কিয়াস সংঘটিত হওয়ার জন্য চারটি মৌলিক উপাদান অপরিহার্য:

১. **আল-আসল (الأصل):** মূল বিষয় বা বস্তু, যার সম্পর্কে কুরআন বা সুন্নাহতে সুস্পষ্ট হুকুম বিদ্যমান। একে 'মাকিস আলাইহি' (যার সাথে তুলনা করা হয়) বলা হয়।

২. **আল-ফার' (الفرع):** নতুন উদ্ভূত বিষয় বা বস্তু, যার সম্পর্কে কুরআন বা সুন্নাহতে সুস্পষ্ট হুকুম নেই এবং যার হুকুম নির্ধারণের জন্য কিয়াসের আশ্রয় নেওয়া হয়। একে 'মাকিস' (যার তুলনা করা হয়) বলা হয়।

৩. **আল-'ইল্লাহ (العلة):** মূল বিষয় (আসল) এর হুকুমের অন্তর্নিহিত কারণ বা বৈশিষ্ট্য, যা মূল বিষয় ও নতুন বিষয়ের (ফার') মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এই কারণের ভিত্তিতেই উভয়ের হুকুম একই হবে বলে ধরে নেওয়া হয়।

৪. **হুকম আল-আসল (حكم الأصل):** মূল বিষয়ের (আসল) শরঈ হুকুম, যা কুরআন বা সুন্নাহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

উদাহরণস্বরূপ: কুরআনুল কারীমে মদ (الخمر) পান করা হারাম। মদের 'ইল্লাহ' (অন্তর্নিহিত কারণ) হলো এটি নেশা সৃষ্টিকারী। বর্তমানে বাজারে নতুন নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় (যেমন - বিয়ার, হুইস্কি ইত্যাদি) পাওয়া যায়। কিয়াসের মাধ্যমে এই নতুন পানীয়গুলোকে মদের সাথে তুলনা করে একই হুকুম (হারাম) আরোপ করা হয়, কারণ উভয়ের মধ্যে নেশা সৃষ্টিকারী হওয়ার অভিন্ন 'ইল্লাহ' বিদ্যমান।

কিয়াস কি শরীয়তের একটি স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়?

অধিকাংশ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের উলামাগণ কিয়াসকে ইসলামী শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেন। কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে এর প্রামাণিকতা প্রমাণিত।

১. কুরআনের দলিল:

* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ"

(সূরা আল-হাশর: ২)

(অতএব, হে চক্ষুষ্মানগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।)

এই আয়াতে 'ই'তিবার' (اعتبار) শব্দের অর্থ হলো এক জিনিস থেকে অন্য জিনিসের শিক্ষা গ্রহণ করা বা তুলনা করা, যা কিয়াসের মূল ভিত্তি।

২. সুন্নাহর দলিল:

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিয়াসভিত্তিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। উদাহরণস্বরূপ, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তার মায়ের উপর হজ ফরজ থাকা অবস্থায় যদি তিনি মারা যান, তবে তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করা যাবে কিনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকত, তবে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না? সুতরাং আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করা আরও বেশি কর্তব্য।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর্থিক ঋণের সাথে আল্লাহর হক (হজ) এর সাদৃশ্য স্থাপন করে কিয়াস করেছেন।

* মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "যদি তোমার কাছে কোনো মাসআলা আসে, তবে তুমি কিভাবে ফয়সালা করবে?" তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করব।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যদি তুমি তা আল্লাহর কিতাবে না পাও?" তিনি বললেন, "তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যদি তুমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহতেও না পাও?" তিনি বললেন, "তবে আমি আমার বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ করব এবং কোনো ত্রুটি করব না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বুকে হাত মেরে বললেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে এমন তাওফীক দিয়েছেন যা রাসূলকে সন্তুষ্ট করে।" (সুনানে আবু দাউদ) এই হাদীসে 'ইজতিহাদ' এর একটি পদ্ধতি হলো কিয়াস।

৩. সাহাবায়ে কেরামের আমল:

* সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বিভিন্ন নতুন মাসআলার সমাধানে কিয়াসের আশ্রয় নিতেন এবং এর মাধ্যমে শরঈ হুকুম নির্ধারণ করতেন। তাদের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য বিরোধিতা দেখা যায়নি, যা কিয়াসের প্রামাণিকতার উপর এক প্রকার ইজমা' (ঐকমত্য) প্রমাণ করে।

তবে, কিয়াসকে শরীয়তের একটি স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে:

- কিয়াস কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধানের (নস) বিরোধী হতে পারবে না।
- কিয়াসের ভিত্তি অবশ্যই এমন একটি 'ইল্লাহ' হতে হবে যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত অথবা যুক্তিসঙ্গতভাবে বোধগম্য।
- কিয়াস অবশ্যই অভিজ্ঞ ও যোগ্য মুজতাহিদগণ কর্তৃক সম্পাদিত হতে হবে।

অতএব, কিয়াস সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎস না হলেও, কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে নতুন মাসআলার শরঈ হুকুম নির্ধারণের একটি অপরিহার্য পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং উলামাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মতে এটি শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যারা জাহেরী মাযহাবের অনুসারী, তারা সুস্পষ্ট নস বিদ্যমান না থাকলে কিয়াসকে শরীয়তের উৎস হিসেবে স্বীকার করেন না। তবে, তাদের এই মত অধিকাংশ উলামাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

(٢٤) ما هي البدعة في الدين؟ وما هي أنواعها؟ وما هو حكم ارتكابها؟

দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত (নব উদ্ভাবন) কী? এবং এর প্রকারভেদগুলো কী কী? এবং তা করা হুকুম কী?

দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত (البدعة) কী? এবং এর প্রকারভেদগুলো কী কী? এবং তা করা হুকুম কী?

দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত (البدعة) কী?

আভিধানিক অর্থে বিদ'আত (البدعة) মানে হলো পূর্বেকার কোনো দৃষ্টান্ত ছাড়াই নতুন কিছু উদ্ভাবন করা বা সৃষ্টি করা।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, বিদ'আত (البدعة في الدين) বলা হয় দ্বীনের মধ্যে এমন কোনো নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা বা প্রবর্তন করা, যা কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিলের পরিপন্থী অথবা যার কোনো ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহতে বিদ্যমান নেই এবং যা ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। বিদ'আত মূলত দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা এবং শরীয়তের পূর্ণতাকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করার শামিল।

ইমাম শাতেবী (রহঃ) বিদ'আতের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন: "বিদ'আত হলো শরীয়তের এমন একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যার মাধ্যমে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা হয়।"

বিদ'আতের প্রকারভেদ:

আলেমগণ বিদ'আতকে মূলত দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন:

১. বিদ'আতে আকীদা (البدعة الاعتقادية) বা বিদ'আতে কাউলিয়া (البدعة القولية): এটি বিশ্বাস ও কথার সাথে সম্পৃক্ত বিদ'আত। এর অন্তর্ভুক্ত হলো দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা অথবা এমন কোনো কথা বলা যা কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিরোধী। যেমন:

* আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী বা কর্মের ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটানো।
* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অন্য কোনো নবীর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা।
* সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-দের সমালোচনা করা বা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।
* তাকদীর বা ঈমানের অন্যান্য স্তম্ভের ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা।
* এমন কোনো আকীদা পোষণ করা যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদার বিরোধী।

২. বিদ'আতে আমলিয়া (البدعة العملية) বা বিদ'আতে ফেলিয়া (البدعة الفعلية): এটি আমল (কর্ম) ও ইবাদতের পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত বিদ'আত। এর অন্তর্ভুক্ত হলো এমন কোনো নতুন ইবাদত বা ইবাদতের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যা শরীয়তে অনুমোদিত নয়। যেমন:

* শরীয়তে নির্ধারিত ইবাদতের সংখ্যা বা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা (যেমন - পাঁচ ওয়াক্তের সালাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা)।
* শরীয়তে অনুমোদিত নয় এমন সময়ে নফল ইবাদত করা (যেমন - নিষিদ্ধ সময়ে সালাত আদায় করা)।
* এমন কোনো পদ্ধতিতে যিকির বা দু'আ করা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি বহির্ভূত।
* দ্বীনের মধ্যে নতুন কোনো উৎসব বা প্রথা চালু করা যার কোনো ভিত্তি শরীয়তে নেই (যেমন - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন পালন করা)।

* এমন কোনো পোশাক পরিধান করা বা আচার-আচরণ করা যা বিশেষভাবে কোনো বিদ'আতী গোষ্ঠীর পরিচয় বহন করে।

কিছু আলেম বিদ'আতকে আরও বিস্তারিতভাবে ভাগ করেছেন, যেমন:

- **বিদ'আতে মুহাক্কিমা (البدعة المحكمة):** যা সুস্পষ্ট কুফরের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।
- **বিদ'আতে মুকাফ্ফিরা (البدعة المكفرة):** যার কারণে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়।
- **বিদ'আতে গাইরু মুকাফ্ফিরা (البدعة غير المكفرة):** যা কুফরের পর্যায়ে না পৌঁছালেও গুনাহের কাজ।

তবে, মূল বিভাজন বিশ্বাস ও কর্মের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে।

বিদ'আত করার হুকুম:

ইসলামে বিদ'আত করা হারাম এবং এটি একটি জঘন্যতম পাপ। কুরআন ও সুন্নাহয় বিদ'আতের কঠোর নিন্দা করা হয়েছে এবং তা থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

- **কুরআনের দলিল:**
  - আল্লাহ তা'আলা বলেন: **"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"** (সূরা আল-মায়িদাহ: ৩) (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।) এই আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন এবং এতে নতুন কিছু সংযোজন করার কোনো অবকাশ নেই। বিদ'আত মূলত এই পূর্ণতাকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করার শামিল।
- **সুন্নাহর দলিল:**
  - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **" مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ"** (সহীহ বুখারী: ২৬৯৭, সহীহ মুসলিম: ১৭১৮) (যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন উদ্ভাবন করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।) অন্য বর্ণনায় এসেছে: **" مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"** (যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করবে যার ব্যাপারে আমাদের কোনো নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে)।
  - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: **" وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ"** (সুনানে আবু দাউদ: ৪৬০৭, সুনানে তিরমিযী: ২৬৭৬) (তোমরা নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ থেকে সাবধান থাকো, কারণ প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয় বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।)

এই সকল স্পষ্ট দলিল থেকে প্রতীয়মান হয় যে দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত করা সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং তা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামের কারণ হতে পারে। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জন করে বিদ'আত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং সুন্নাহর উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা।

(٢٥) ما هو التوحيد العملي؟ وكيف يتحقق في حياة المسلم؟

আমলী তাওহীদ কী? এবং কিভাবে একজন মুসলিমের জীবনে তা বাস্তবায়িত হতে পারে?

আমলী তাওহীদ (التوحيد العملي) কী? এবং কিভাবে একজন মুসলিমের জীবনে তা বাস্তবায়িত হতে পারে?

আমলী তাওহীদ (التوحيد العملي) কী?

আমলী তাওহীদ (التوحيد العملي) বা ব্যবহারিক তাওহীদ হলো আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা। এর অর্থ হলো একজন মুসলিমের সকল কাজ, ইবাদত, আচার-আচরণ, লেনদেন এবং জীবনের সকল দিক শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নির্দেশনার আলোকে পরিচালিত হবে। আমলী তাওহীদ মূলত তাওহীদে উলুহিয়্যাহ (আল্লাহর ইবাদতে একত্ববাদ) এর বাস্তবায়ন।

সহজভাবে বলতে গেলে, আমলী তাওহীদ হলো এই বিশ্বাস রাখা যে একমাত্র আল্লাহই ইবাদতের যোগ্য এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর শরীয়তের অনুসরণ করা। এর মধ্যে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, তাঁর উপর ভরসা করা, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং সকল প্রকার শিরক (আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা) ও বিদ'আত (দ্বীনের মধ্যে নব উদ্ভাবন) থেকে বেঁচে থাকা অন্তর্ভুক্ত।

একজন মুসলিমের জীবনে আমলী তাওহীদ কিভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে?

একজন মুসলিমের জীবনে আমলী তাওহীদ বাস্তবায়নের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. **একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা:** জীবনের সকল প্রকার ইবাদত - যেমন সালাত, সাওম, যাকাত, হজ, দু'আ, মান্নত, কুরবানী ইত্যাদি - শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদন করা এবং এগুলোতে কোনো প্রকার শিরক না করা।

২. **আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা (তাওয়াক্কুল):** জীবনের সকল বিষয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করা এবং বিশ্বাস রাখা যে তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী ও সমস্যা সমাধানকারী। তবে এর পাশাপাশি বৈধ উপায় অবলম্বন করাও জরুরি।

৩. **একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া (ইস্তিয়ানা):** সকল প্রয়োজনে একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং বিশ্বাস রাখা যে তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস।

৪. **আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা:** যা কিছু আল্লাহ ভালোবাসেন তা ভালোবাসা এবং যা কিছু তিনি অপছন্দ করেন তা অপছন্দ করা। মানুষের সাথে সম্পর্ক আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর ভিত্তি করে স্থাপন করা।

৫. **আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করা:** জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান মেনে চলা এবং নিজের খেয়াল-খুশি বা সমাজের প্রথাকে আল্লাহর বিধানের উপর প্রাধান্য না দেওয়া।

৬. **সকল প্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকা:** বড় শিরক (যেমন - আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইবাদতে শরীক করা) এবং ছোট শিরক (যেমন - লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা) উভয় প্রকার শিরক থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

৭. **বিদ'আত পরিহার করা:** দ্বীনের মধ্যে কোনো প্রকার নতুন ইবাদত বা প্রথা উদ্ভাবন করা থেকে বিরত থাকা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর অনুসরণ করা।

৮. **আল্লাহর যিকির ও স্মরণ:** সর্বদা আল্লাহর যিকির করা, তাঁর গুণাবলী স্মরণ করা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়া।

৯. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ: সমাজের মধ্যে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধে সাধ্যমত চেষ্টা করা।

১০. জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর ভয় (তাকওয়া) অবলম্বন করা: প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলা এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকা।

১১. আল্লাহর নামে শপথ করা: একমাত্র আল্লাহর নামেই শপথ করা এবং মিথ্যা শপথ থেকে বেঁচে থাকা।

১২. আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকা: জীবনের সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং ধৈর্য ধারণ করা।

আমলী তাওহীদ একজন মুসলিমের ঈমানের পূর্ণতার জন্য অপরিহার্য। এটি শুধুমাত্র একটি বিশ্বাস নয়, বরং একটি জীবন পদ্ধতি যা একজন মুমিনকে আল্লাহর পথে অবিচল রাখে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্য করে। একজন মুসলিম যখন তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদকে বাস্তবায়ন করে, তখনই তার জীবন প্রকৃত অর্থে ইসলামী জীবন হিসেবে গড়ে ওঠে।

(٢٦) ما هي أهمية الأخلاق في الإسلام؟ وما هي بعض الأخلاق التي حث عليها الإسلام؟

ইসলামে আখলাকের (চরিত্র) গুরুত্ব কী? এবং ইসলাম যেসব আখলাকের প্রতি উৎসাহিত করেছে তার কিছু উদাহরণ কী?

ইসলামে আখলাকের (চরিত্র) গুরুত্ব কী? এবং ইসলাম যেসব আখলাকের প্রতি উৎসাহিত করেছে তার কিছু উদাহরণ কী?

ইসলামে আখলাকের গুরুত্ব:

ইসলামে আখলাকের (চরিত্র) গুরুত্ব অপরিসীম। এটি দ্বীনের একটি অপরিহার্য অংশ এবং ঈমানের পূর্ণতার অন্যতম মাপকাঠি। কুরআন ও সুন্নাহয় আখলাকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং উত্তম চরিত্রকে মুমিনের শ্রেষ্ঠ গুণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

- **রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য:** রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং বলেছেন, "**ইন্নামা বু'ইস্তু লিউতাম্মিমা মাকারিমা আল-আখলাক**" (আমাকে সর্বোত্তম চরিত্র পূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে)। (মুয়াত্তা মালিক) এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, উত্তম চরিত্র গঠন ও বিকাশ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল।
- **ঈমানের পূর্ণতা:** রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "**আকমালুল মু'মিনীন ঈমানান আহসানুহুম খুলুকান**" (ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ মুমিন সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর)। (সুনানে তিরমিযী)
- **আমলের শ্রেষ্ঠত্ব:** রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "**মা মিন শাইয়িন আসকালু ফিল মীযানি মিন হুসনিল খুলুক**" (কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী আমল হবে উত্তম চরিত্র)। (সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযী)

- **জান্নাত লাভের মাধ্যম:** উত্তম চরিত্র জান্নাত লাভের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন জিনিসটি মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "আল্লাহর ভয় এবং উত্তম চরিত্র।" (সুনানে তিরমিযী)
- **সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ:** উত্তম চরিত্র ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে, পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি করতে এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইসলাম যেসব আখলাকের প্রতি উৎসাহিত করেছে তার কিছু উদাহরণ:

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে উন্নত ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. **সত্যবাদিতা (আস-সিদক):** কথায় ও কাজে সত্যবাদী হওয়া এবং মিথ্যা পরিহার করা। আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদীদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে পুরষ্কারের ওয়াদা করেছেন।

২. **আমানতদারী (আল-আমানাহ):** অর্পিত দায়িত্ব ও আমানত যথাযথভাবে পালন করা। খেয়ানত করা মুনাফিকের লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত।

৩. **ন্যায়পরায়ণতা (আল-'আদল):** সকলের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা, পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা এবং ন্যায্য বিচার করা।

৪. **ধৈর্য (আস-সবর):** বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহর উপর ভরসা রাখা এবং হতাশ না হওয়া।

৫. **ক্ষমা (আল-'আফউ):** অন্যের ভুল ও ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া এবং প্রতিশোধের স্পৃহা দমন করা।

৬. **দয়া ও সহানুভূতি (আর-রাহমাহ):** সকল সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, দুর্বল ও অসহায়দের প্রতি সদয় আচরণ করা।

৭. **বিনয় (আত-তাওয়াদু'):** অহংকার পরিহার করে নম্র ও ভদ্র আচরণ করা।

৮. **সৎকর্মশীলতা (আল-ইহসান):** নিজের সাধ্যমত অন্যের উপকার করা এবং সকল কাজ সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা।

৯. **প্রতিশ্রুতি রক্ষা (আল-ওয়াফা বিল-'আহদ):** প্রদত্ত ওয়াদা ও চুক্তি যথাযথভাবে পালন করা।

১০. **সচ্চরিত্র ও লজ্জাশীলতা (আল-হায়া):** শালীন ও সংযত আচরণ করা এবং অশ্লীলতা পরিহার করা।

১১. **আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা (সিলাতুর রাহিম):** নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের খোঁজখবর নেওয়া।

১২. **প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা:** প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং তাদের কোনো প্রকার কষ্ট না দেওয়া।

১৩. **সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ (আল-আমর বিল মা'রুফ ওয়া আন-নাহী আনিল মুনকার):** সমাজে ভালো কাজের প্রচার এবং খারাপ কাজের প্রতিরোধ করা।

১৪. **সুন্দর ব্যবহার ও ভদ্রতা (হুসনুল খুলুক):** সকলের সাথে হাসিমুখে কথা বলা, সম্মানজনক আচরণ করা এবং কর্কশ ভাষা পরিহার করা।

ইসলামে আখলাকের গুরুত্ব এত বেশি যে, অনেক ক্ষেত্রে ইবাদতের পূর্ণতাও উত্তম চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আখলাকের প্রতিফলন অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার তাওফিক দান কর। আমীন।

(٢٧) ما هو الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان؟

ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের মধ্যে পার্থক্য কী?

ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের মধ্যে পার্থক্য কী?

ঈমান, ইসলাম ও ইহসান - এই তিনটি শব্দ ইসলামী শরীয়তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো দ্বীনের তিনটি স্তর বা পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। এদের মধ্যে পার্থক্য হলো:

১. ইসলাম (الإسلام):

- আভিধানিক অর্থ: আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া, শান্তি।
- শরীয়তের পরিভাষায়: বাহ্যিক আমল ও কার্যাবলীর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।
- ইসলামের স্তম্ভ: পাঁচটি - শাহাদা (সাক্ষ্য দেওয়া), সালাত (নামাজ প্রতিষ্ঠা করা), যাকাত (যাকাত প্রদান করা), সাওম (রমজানের রোজা রাখা), ও হজ (সামর্থ্য থাকলে মক্কায় হজ করা)।
- ইসলাম মূলত মানুষের বাহ্যিক দিক এবং শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের উপর জোর দেয়। যে ব্যক্তি এই পাঁচটি স্তম্ভের সাক্ষ্য দেয় ও পালন করে, তাকে মুসলিম বলা হয়।

২. ঈমান (الإيمان):

- আভিধানিক অর্থ: বিশ্বাস স্থাপন করা, স্বীকৃতি দেওয়া, নিরাপত্তা দান করা।
- শরীয়তের পরিভাষায়: আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা।
- ঈমানের স্তম্ভ: ছয়টি - আল্লাহর উপর ঈমান, ফেরেশতাদের উপর ঈমান, কিতাবসমূহের উপর ঈমান, রাসূলগণের উপর ঈমান, শেষ দিবসের উপর ঈমান এবং তাকদীরের উপর ঈমান।
- ঈমান মূলত মানুষের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস ও হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত। একজন মুসলিমের ঈমান যতক্ষণ পর্যন্ত এই ছয়টি বিষয়ের উপর দৃঢ় না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না। ঈমান ইসলাম অপেক্ষা অধিক ব্যাপক, কারণ বাহ্যিক আমলের সাথে সাথে আন্তরিক বিশ্বাসও এতে অন্তর্ভুক্ত।

৩. ইহসান (الإحسان):

- আভিধানিক অর্থ: উত্তমতা, সৌন্দর্য, নিখুঁততা, অনুগ্রহ।
- শরীয়তের পরিভাষায়: এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর যদি তুমি তাঁকে নাও দেখো তবে এই বিশ্বাস রাখা যে তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।

- ইহসান হলো দ্বীনের সর্বোচ্চ স্তর, যেখানে একজন মুমিন আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে। এটি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় আমলকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বোচ্চ পর্যায়।
- ইহসান কেবল ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রতিটি কাজ সুন্দর ও নিখুঁতভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করাই ইহসান।

পার্থক্য:

সহজভাবে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

- **ইসলাম:** দ্বীনের বাহ্যিক কাঠামো ও আমল। এটি ঈমানের ভিত্তি। প্রত্যেক মুমিনকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে।
- **ঈমান:** দ্বীনের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস ও হৃদয়ের স্বীকৃতি। এটি ইসলামের মূল চালিকাশক্তি। বাহ্যিক আমল আন্তরিক বিশ্বাস ছাড়া আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।
- **ইহসান:** দ্বীনের সর্বোচ্চ স্তর, যেখানে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় আমলকে নিখুঁতভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পাদন করা হয়। প্রত্যেক মুহসিন (ইহসানকারী) মুমিন ও মুসলিম, কিন্তু প্রত্যেক মুমিন মুহসিন নাও হতে পারে এবং প্রত্যেক মুসলিম মুমিন নাও হতে পারে (যেমন - দুর্বল ঈমানের অধিকারী বা কেবল বাহ্যিকভাবে ইসলাম পালনকারী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত হাদীসে জিবরীল (আঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে এই তিনটি বিষয় স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে জিবরীল (আঃ) প্রথমে ইসলাম, তারপর ঈমান এবং সবশেষে ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন, যা এই তিনটি বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মর্যাদার স্তরকে স্পষ্ট করে তোলে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম হলো দ্বীনের ভিত্তি, ঈমান হলো তার মূল এবং ইহসান হলো তার পূর্ণতা ও সৌন্দর্য। একজন মুসলিমের জন্য এই তিনটি স্তরের জ্ঞান অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা অপরিহার্য।

(٢٨) ما هي الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر؟

মুজিজা, কারামত ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য কী?

মুজিজা, কারামত ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য কী?

মুজিজা (معجزة), কারামত (كرامة) ও যাদু (سحر) - এই তিনটি বিষয় আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক মনে হলেও ইসলামী শরীয়তে এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

১. মুজিজা (معجزة):

- **সংজ্ঞা:** মুজিজা হলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর নবী ও রাসূলগণকে (আলাইহিমুস সালাম) প্রদত্ত এমন অসাধারণ ও অলৌকিক ক্ষমতা বা নিদর্শন, যা নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণ করে এবং যা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে।
- **উৎস:** এর উৎস সরাসরি আল্লাহ তা'আলা।

- **উদ্দেশ্য:** নবীদের সত্যতা প্রমাণ করা, অবিশ্বাসীদের চ্যালেঞ্জ জানানো এবং মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি করা।
- **কর্তৃত্ব:** এটি একমাত্র নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়।
- **স্থায়িত্ব ও প্রভাব:** সাধারণত এটি তাৎক্ষণিক ও সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তারকারী হয় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। এর মাধ্যমে কল্যাণ ও উপকার সাধিত হয়।
- **উদাহরণ:**
    - মুসা (আঃ)-এর লাঠি সাপে পরিণত হওয়া।
    - ঈসা (আঃ)-এর মৃতকে জীবিত করা ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করা।
    - মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আঙ্গুল থেকে পানি নির্গত হওয়া ও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া। কুরআনুল কারীম স্বয়ং একটি স্থায়ী মুজিজা।

২. কারামত (كرامة):

- **সংজ্ঞা:** কারামত হলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর নেককার, পরহেজগার ও ওলী (বন্ধু) বান্দাদের (নবী ও রাসূল ব্যতীত) মাধ্যমে প্রকাশিত অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনা বা অনুগ্রহ।
- **উৎস:** এর উৎসও আল্লাহ তা'আলা।
- **উদ্দেশ্য:** আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান ও আনুগত্যের মর্যাদা প্রকাশ করা, মুমিনদের উৎসাহিত করা এবং কোনো বিশেষ প্রয়োজনে সাহায্য করা। এটি নবুওয়তের দাবি নয়।
- **কর্তৃত্ব:** এটি নবী-রাসূলগণ ব্যতীত আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে।
- **স্থায়িত্ব ও প্রভাব:** এর প্রভাব সাধারণত মুজিজার তুলনায় কম হয় এবং এটি ব্যক্তির বিশেষ অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। এর মাধ্যমেও কল্যাণ সাধিত হতে পারে।
- **উদাহরণ:**
    - মারিয়াম (আঃ)-এর নিকট মৌসুম ছাড়াই ফল আসা।
    - আসহাবুল কাহাফের দীর্ঘকাল ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় অক্ষত থাকা।
    - কোনো ওলীর দূরবর্তী স্থান দেখা বা অস্বাভাবিক রিজিক লাভ করা।

৩. যাদু (سحر):

- **সংজ্ঞা:** যাদু হলো কিছু গোপনীয় উপায়, মন্ত্র, তাবিজ বা কৌশল অবলম্বন করে অস্বাভাবিক প্রভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করা। এর মাধ্যমে মানুষের মন ও ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করা অথবা দৃষ্টি বিভ্রম সৃষ্টি করা যায়।
- **উৎস:** এর উৎস শয়তান ও দুষ্ট জিনদের সাহায্য অথবা কিছু প্রাকৃতিক উপাদানের অপব্যবহার।
- **উদ্দেশ্য:** সাধারণত ক্ষতিসাধন করা, ভয় দেখানো, অবৈধ প্রভাব বিস্তার করা অথবা দৃষ্টি বিভ্রম তৈরি করা।
- **কর্তৃত্ব:** এটি কাফির, ফাসিক ও দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিরাও করতে পারে, যারা শয়তান ও জিনদের সাহায্য নেয়।
- **স্থায়িত্ব ও প্রভাব:** এর প্রভাব সাধারণত ক্ষণস্থায়ী ও দুর্বল হয়, যা কিছু কৌশল ও দৃষ্টি বিভ্রমের উপর নির্ভরশীল। এর মাধ্যমে প্রায়শই ক্ষতি সাধিত হয়।

- **বৈশিষ্ট্য:**
    - এটি শেখা ও অনুশীলন করা যায়।
    - এর প্রভাব আল্লাহর ইচ্ছাধীন নয়, বরং যাদুকরের চেষ্টার উপর নির্ভরশীল (তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো ক্ষতি করতে পারে না)।
    - ইসলামে এটি হারাম ও কবিরা গুনাহ।

সংক্ষেপে পার্থক্য:

বৈশিষ্ট্য	মুজিজা (المعجزة)	কারামত (الكرامة)	যাদু (السحر)
উৎস	আল্লাহ তা'আলা	আল্লাহ তা'আলা	শয়তান/অপব্যবহার
কর্তৃত্ব	নবী ও রাসূলগণ (আঃ)	নেককার ও ওলী বান্দাগণ (রাঃ)	কাফির, ফাসিক, দুর্বল ঈমানের অধিকারী
উদ্দেশ্য	নবুওয়ত প্রমাণ, ঈমান বৃদ্ধি	মর্যাদা প্রকাশ, সাহায্য, উৎসাহ	ক্ষতি, ভয়, প্রভাব, বিভ্রম
স্থায়িত্ব ও প্রভাব	শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে	তুলনামূলক কম ও বিশেষ অবস্থায়	ক্ষণস্থায়ী ও দুর্বল
শেখা ও অনুশীলন	অসম্ভব	অসম্ভব	সম্ভব
শরঈ হুকুম	হক ও সত্য	আল্লাহর অনুগ্রহ ও সত্য	হারাম ও কবিরা গুনাহ

সুতরাং, মুজিজা নবীদের সত্যতার নিদর্শন, কারামত আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং যাদু হলো শয়তানি কর্ম ও প্রতারণা। এই তিনটির মধ্যেকার পার্থক্য জানা একজন মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ভেদাভেদ করতে পারে এবং বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারে।

(২৯) هل يجوز الاستغاثة بغير الله تعالى؟ وما هو حكم الاستعانة بالأموات والأولياء؟

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া কি জায়েজ? মৃত ব্যক্তি ও আওলিয়াদের কাছে সাহায্য চাওয়া হুকুম কী?

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া কি জায়েজ? মৃত ব্যক্তি ও আওলিয়াদের কাছে সাহায্য চাওয়া হুকুম কী?

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েজ আছে কিনা, তা নির্ভর করে সাহায্যের প্রকার ও যার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে তার অবস্থার উপর।

সাধারণ অবস্থায় জীবিত মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া:

যদি কোনো জীবিত ব্যক্তি কোনো কাজে সক্ষম হন এবং তার কাছে সাহায্য চাওয়া হয়, তবে এতে কোনো দোষের কিছু নেই। এটি বৈধ এবং স্বাভাবিক। যেমন - অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা চাওয়া, বিপদে বন্ধুর কাছে সাহায্য চাওয়া, কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য অন্যের সহযোগিতা চাওয়া ইত্যাদি। কুরআন ও সুন্নাহয় এমন সাহায্যের বৈধতা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত এমন কারো কাছে সাহায্য চাওয়া যিনি অনুপস্থিত বা মৃত এবং সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন না:

এই প্রকার সাহায্য চাওয়া ইসলামী শরীয়তে জায়েজ নয় এবং তা **বড় শিরক (الشرك الأكبر)** এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ সাহায্য চাওয়া একটি ইবাদত এবং ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। অনুপস্থিত বা মৃত ব্যক্তি, তা তিনি নবী, রাসূল, ওলী বা যেই হোন না কেন, কারো পক্ষেই কোনো প্রকার সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া আল্লাহর সাথে শরীক করার শামিল।

- **কুরআনের দলিল:**
  - আল্লাহ তা'আলা বলেন: **" وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ"** (সূরা গাফির: ৬০) (আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।) এই আয়াতে দু'আকে ইবাদত বলা হয়েছে এবং একমাত্র আল্লাহর কাছে চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
  - আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন: **" إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ"** (সূরা আল-আনকাবুত: ১৭) (তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকো, তারা তোমাদেরকে রিজিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং আল্লাহর কাছেই রিজিক তালাশ কর, তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।) এই আয়াতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের কাছে রিজিক চাওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে, যা এক প্রকার সাহায্য চাওয়া।
  - আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উপাস্যদের অক্ষমতা বর্ণনা করে বলেন: **" وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ"** (সূরা আল-আ'রাফ: ১৯৭) (আর তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকো, তারা তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।)
- **সুন্নাহর দলিল:**

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **" إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ"** (সুনানে তিরমিযী: ২৫১৬) (যখন তুমি চাইবে, আল্লাহর কাছে চাও। আর যখন তুমি সাহায্য চাইবে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।) এই হাদীস স্পষ্টভাবে একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দেয়।

মৃত ব্যক্তি ও আওলিয়াদের কাছে সাহায্য চাওয়া:

মৃত ব্যক্তি ও আওলিয়াদের কাছে সাহায্য চাওয়া, তাদের কাছে রোগমুক্তি, সন্তান, রিযিক বা অন্য কোনো পার্থিব বা অপার্থিব বিষয়ে চাওয়া সম্পূর্ণরূপে **হারাম ও বড় শিরক** এর অন্তর্ভুক্ত, যদি তাদের রূহ বা সত্তাকে সরাসরি সাহায্য করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। কারণ মৃত ব্যক্তিরা দুনিয়ার সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এবং তাদের কোনো ক্ষমতা নেই যে কারো ডাকে সাড়া দেবেন বা কারো উপকার বা ক্ষতি করবেন।

তবে, আওলিয়াগণের জীবদ্দশায় তাদের কাছে বৈধ বিষয়ে সাহায্য চাওয়া (যেমন - কোনো কাজ করে দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া) জায়েজ, যদি তারা সেই কাজে সক্ষম হন। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর তাদের কাছে কোনো প্রকার সাহায্য চাওয়া জায়েজ নয়।

কিছু লোক মৃত আওলিয়াদের মাজারে গিয়ে তাদের কাছে সাহায্য চায়, তাদের নামে মান্নত করে বা তাদের কাছে সুপারিশ কামনা করে। এই সকল কাজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সঠিক বিশ্বাস:

সঠিক বিশ্বাস হলো এই যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী। তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী এবং তাঁর কাছেই সকল প্রকার প্রয়োজন ও বিপদ-আপদে সাহায্য চাওয়া উচিত। জীবিত বা মৃত কোনো সৃষ্টিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, যতক্ষণ না আল্লাহর হুকুম হয়।

অতএব, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো কাছে এমন সাহায্য চাওয়া যা শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব, তা শিরক। মৃত ব্যক্তি ও আওলিয়াদের কাছে সাহায্য চাওয়া, যদি তাদের রূহকে সরাসরি ক্ষমতাশালী মনে করা হয়, তবে তা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সকলের উচিত এই ধরনের শিরকী কার্যকলাপ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখা এবং একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা।

(٣٠) ما هو التوسل؟ وما هي أنواعه المشروعة والممنوعة؟

তাওয়াসসুল কী? এবং এর শরীয়তসম্মত ও নিষিদ্ধ প্রকারগুলো কী কী?

তাওয়াসসুল কী? এবং এর শরীয়তসম্মত ও নিষিদ্ধ প্রকারগুলো কী কী?

তাওয়াসসুল (التوسل) কী?

তাওয়াসসুল (التوسل) আভিধানিক অর্থে নৈকট্য লাভ করা, মাধ্যম গ্রহণ করা বা কোনো কিছুর সাহায্যে কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করাকে বোঝায়।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, তাওয়াসসুল হলো আল্লাহর কাছে দু'আ করার সময় এমন কোনো মাধ্যম অবলম্বন করা, যা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে এবং দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

তাওয়াসসুলের শরীয়তসম্মত প্রকার:

উলামায়ে কেরাম কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাওয়াসসুলের কিছু বৈধ প্রকার উল্লেখ করেছেন:

১. **আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে তাওয়াসসুল:** আল্লাহর সুন্দর নাম (আসমাউল হুসনা) এবং তাঁর সুউচ্চ গুণাবলীর (সিফাত আল-'ুলইয়া) মাধ্যমে দু'আ করা শরীয়তসম্মত। যেমন বলা: "ইয়া আল্লাহ! আপনি পরম দয়ালু, আপনার দয়ার মাধ্যমে আমার উপর রহম কর।" (يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ ارْحَمْنِي)

২. **সৎ আমলের মাধ্যমে তাওয়াসসুল:** নিজের কোনো সৎ আমলের (যেমন - সালাত, সাওম, যাকাত, কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর পথে জিহাদ ইত্যাদি) উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে দু'আ করা জায়েজ। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত গুহার তিন ব্যক্তির ঘটনা এর সুস্পষ্ট প্রমাণ, যেখানে তারা তাদের নিজ নিজ সৎ আমলের ওসিলায় আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছিল এবং আল্লাহ তাদের বিপদ দূর করেছিলেন।

৩. **নেককার জীবিত ব্যক্তির দু'আর মাধ্যমে তাওয়াসসুল:** কোনো নেককার ও পরহেজগার জীবিত ব্যক্তির কাছে নিজের জন্য দু'আ চাওয়া শরীয়তসম্মত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁর কাছে দু'আর অনুরোধ করতেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) দুর্ভিক্ষের সময় আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর কাছে বৃষ্টির জন্য দু'আ চেয়েছিলেন, যা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে। তবে এক্ষেত্রে চাওয়া উচিত আল্লাহর কাছে, আর ঐ নেককার ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন।

তাওয়াসসুলের নিষিদ্ধ প্রকার:

শরীয়তে তাওয়াসসুলের কিছু প্রকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা শিরকের দিকে ধাবিত করে অথবা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. **মৃত ব্যক্তি বা অনুপস্থিত ব্যক্তির মাধ্যমে তাওয়াসসুল:** মৃত নবী, ওলী বা অন্য কোনো ব্যক্তির সত্তা, মর্যাদা বা অধিকারের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দু'আ করা জায়েজ নয়। কারণ মৃত ব্যক্তিরা দুনিয়ার সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এবং কারো ডাকে সাড়া দেওয়ার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখেন না। এটি বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যদি তাদের ঐ ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

২. **নবী, ওলী বা অন্য কারো নামের শপথ করে দু'আ করা:** আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করে দু'আ করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। শপথ একমাত্র আল্লাহর নামেই করা উচিত।

৩. **এমন কোনো মাধ্যম অবলম্বন করা যার কোনো শরঈ ভিত্তি নেই:** এমন কোনো বিদ'আতী উপায় বা পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত নয়।

৪. **আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থতাকারী স্থাপন করা:** এই বিশ্বাস রাখা যে নবী, ওলী বা অন্য কোনো ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বান্দার দু'আ পৌঁছে দেন বা সুপারিশ করেন এবং আল্লাহ সরাসরি বান্দার দু'আ শোনেন না - এই ধরনের বিশ্বাস রাখা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা সরাসরি তাঁর বান্দাদের দু'আ শোনেন এবং কবুল করেন।

সারসংক্ষেপ:

তাওয়াসসুল মূলত আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার একটি মাধ্যম। শরীয়তে এর বৈধ প্রকারগুলো হলো আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে, নিজের সৎ আমলের মাধ্যমে এবং কোনো নেককার জীবিত ব্যক্তির দু'আর মাধ্যমে তাওয়াসসুল করা। অন্যদিকে, মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তির মাধ্যমে, কারো নামের শপথ করে অথবা শরীয়তবিরোধী কোনো মাধ্যমের মাধ্যমে তাওয়াসসুল করা নিষিদ্ধ। আমাদের উচিত শরীয়তসম্মত উপায়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং শিরক ও বিদ'আত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা।

(٣١) ما هو حكم زيارة القبور؟ وما هي الآداب التي يجب مراعاتها عند زيارتها؟

কবর যিয়ারতের হুকুম কী? এবং কবর যিয়ারতের সময় কোন কোন আদব (শিষ্টাচার) মেনে চলা উচিত?

কবর যিয়ারতের হুকুম কী? এবং কবর যিয়ারতের সময় কোন কোন আদব (শিষ্টাচার) মেনে চলা উচিত?

কবর যিয়ারতের হুকুম:

ইসলামে কবর যিয়ারতের হুকুম প্রাথমিকভাবে মাকরূহ (অপছন্দনীয়) ছিল। তবে পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি দিয়েছেন এবং একে উৎসাহিত করেছেন। কবর যিয়ারতের হুকুমের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য থাকলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে এর হুকুম হলো **সুন্নাত** (নিয়মিত পালনীয়)। পুরুষদের জন্য কবর যিয়ারত করা সুন্নাত, তবে নারীদের জন্য এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিছু আলেম নারীদের জন্য কবর যিয়ারত করা মাকরূহ তানযীহী (কম অপছন্দনীয়) বলেছেন, আবার কেউ কেউ বিশেষ পরিস্থিতিতে (যেমন - ধৈর্য ধারণের উদ্দেশ্যে) অনুমতি দিয়েছেন। তবে সাধারণভাবে পুরুষদের জন্য কবর যিয়ারত করা সুন্নাত।

কবর যিয়ারতের মূল উদ্দেশ্য হলো:

- মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং দুনিয়ার প্রতি মোহ কমানো।
- আখিরাতের কথা স্মরণ করা এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।
- মৃত ব্যক্তিদের জন্য দু'আ করা এবং তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া।

কবর যিয়ারতের সময় যে সকল আদব (শিষ্টাচার) মেনে চলা উচিত:

কবর যিয়ারতের সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব ও নিয়মকানুন মেনে চলা উচিত, যা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত:

১. **শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে যাওয়া:** কবরস্থানে তাড়াহুড়ো না করে শান্ত ও সম্মানের সাথে যাওয়া উচিত।

২. **কবরবাসীদের সালাম দেওয়া:** কবরস্থানে প্রবেশ করে কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে সালাম দেওয়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের নিয়ম শিখিয়েছেন: "**আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ দিয়ারি মিনাল মু'মিনীন ওয়াল মুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইন শা'আল্লাহু বিকুম লাহিকুন, নাসআলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল 'আফিয়াহ**" (হে মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। নিশ্চয়ই আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি)। (সহীহ মুসলিম)

৩. **কবরের উপর না বসা ও না হাঁটা:** কবরের উপর বসা অথবা হাঁটা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "**তোমাদের কারো জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসা এবং তা তার কাপড় ও চামড়া ভেদ করে যাওয়া কবরের উপর বসার চেয়েও উত্তম**"। (সহীহ মুসলিম)

৪. **কবরকে পদদলিত না করা:** কবরকে পদদলিত করা বা অসম্মান করা উচিত নয়।

5. **কবরের দিকে মুখ করে দু'আ না করা:** দু'আ করার সময় কেবল আল্লাহর দিকে মুখ করা উচিত, কবরের দিকে নয়। কবরকে কিবলা বানানো বা তার দিকে মুখ করে ইবাদত করা জায়েজ নয়।
6. **কবরবাসীর কাছে কিছু না চাওয়া:** কবরবাসীর কাছে কোনো প্রকার সাহায্য, সুপারিশ বা রোগমুক্তি চাওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং শিরকের অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র আল্লাহর কাছেই সবকিছু চাইতে হবে।
7. **অযথা চিৎকার বা মাতম না করা:** কবরস্থানে গিয়ে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা, মাতম করা বা শোক প্রকাশ করা ইসলামে অনুমোদিত নয়। বরং ধৈর্য ধারণ করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা উচিত।
8. **কবরকে পাকা না করা ও তার উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ না করা:** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, তার উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করতে এবং চুনকাম করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ মুসলিম) তবে সাধারণ চিহ্নিতকরণের জন্য সামান্য চিহ্ন রাখা যেতে পারে।
9. **কবরস্থানে অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা:** কবরস্থানের পরিবেশের সম্মান বজায় রাখা উচিত এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা উচিত।
10. **সৎ নিয়তে যাওয়া:** কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হতে হবে মৃত্যুকে স্মরণ করা, আখিরাতের কথা ভাবা এবং মৃতদের জন্য দু'আ করা। কোনো প্রকার শিরকী বা বিদ'আতী উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা জায়েজ নয়।
11. **নারীদের জন্য সতর্কতা:** নারীদের কবর যিয়ারতের ক্ষেত্রে ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা শরীয়তের অন্যান্য বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তা পরিহার করা উচিত।

কবর যিয়ারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা আমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করে। তবে এর আদব ও নিয়মকানুন মেনে চলা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিক পথে চলার তাওফিক দান কর।

(٣٢) ما هو حكم الاحتفال بالموالد والأعياد المبتدعة؟

মীলাদ ও বিদ'আতী ঈদ উদযাপন করার হুকুম কী?

মীলাদ ও বিদ'আতী ঈদ উদযাপন করার হুকুম কী?

ইসলামী শরীয়তে মীলাদ (নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন উদযাপন) এবং অন্যান্য বিদ'আতী ঈদ উদযাপন করা **হারাম ও নিষিদ্ধ**। এর কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

মীলাদ উদযাপন করার হুকুম:

- **শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই:** কুরআনুল কারীম বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর কোথাও নবী (সাঃ)-এর জন্মদিন পালনের কোনো নির্দেশ বা অনুমোদন নেই। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবেঈন (রহঃ) বা ইসলামের প্রথম যুগের কোনো নির্ভরযোগ্য ইমামও মীলাদ উদযাপন করেননি। যদি এটি কোনো কল্যাণকর কাজ হতো, তবে তাঁরা অবশ্যই তা করতেন এবং আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন।
- **দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন (বিদ'আত):** মীলাদ উদযাপন দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন প্রথা উদ্ভাবন করা, যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদ'আত সম্পর্কে কঠোরWarning দিয়েছেন এবং তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "**তোমরা নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ থেকে সাবধান থাকো, কারণ প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয় বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম**"। (সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযী)
- **নবী (সাঃ)-এর প্রতি বাড়াবাড়ি:** মীলাদ উদযাপনের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে নবী (সাঃ)-এর শানে বাড়াবাড়ি করা হয়, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। তাঁকে আল্লাহর আসনে বসানো বা তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক গুণাবলী আরোপ করার প্রবণতা দেখা যায়, যা শিরকের দিকে ধাবিত করে।
- **অমুসলিমদের অনুসরণ:** জন্মদিন পালনের প্রথা মূলত অমুসলিমদের সংস্কৃতি থেকে এসেছে। মুসলিমদের জন্য তাদের ধর্মীয় বা ঐতিহ্যবাহী প্রথা অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত নয়।

বিদ'আতী ঈদ উদযাপন করার হুকুম:

ইসলামে মূলত দুইটি ঈদ রয়েছে - ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এই দুইটি ঈদই শরীয়তসম্মত এবং কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এই দুইটি ঈদ ব্যতীত অন্য কোনো ঈদ উদযাপন করা, যা দ্বীনের মধ্যে নতুনভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছে, তা **বিদ'আত ও হারাম**।

- **শরীয়তে অনুমোদিত ঈদের সংখ্যা নির্দিষ্ট:** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "**আমাদের জন্য দুইটি ঈদ - ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা**"। (সুনানে আবু দাউদ) এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে ইসলামে ঈদ পালনের জন্য এই দুইটি দিনই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
- **অন্যান্য ঈদ উদযাপন বিদ'আত:** এই দুইটি ঈদ ব্যতীত অন্য কোনো ঈদ উদযাপন করা, তা কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হোক না কেন (যদি তা শরীয়তের অনুমোদনবিহীন হয়), তবে তা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন - কোনো পীর বা বুযুর্গের মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করা, কোনো বিশেষ দিনে ধর্মীয় উৎসব পালন করা যার কোনো ভিত্তি শরীয়তে নেই ইত্যাদি।
- **দ্বীনের পূর্ণতার পরিপন্থী:** আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে পরিপূর্ণ দ্বীন হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং, দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করার কোনো অবকাশ নেই। বিদ'আতী ঈদ উদযাপন মূলত দ্বীনের পূর্ণতাকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করার শামিল।

সারসংক্ষেপ:

মীলাদ উদযাপন এবং শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত দুইটি ঈদ (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) ব্যতীত অন্য কোনো ঈদ উদযাপন করা ইসলামী শরীয়তে **হারাম ও নিষিদ্ধ**। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত কুরআন ও সুন্নাহর

আলোকে জীবন পরিচালনা করা এবং সকল প্রকার বিদ'আত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথে অবিচল থাকার তাওফিক দান কর।

(৩৩) ما هي علامات الساعة الصغرى والكبرى؟ وما هي أهميتها للمسلم؟

কেয়ামতের ছোট ও বড় আলামতগুলো কী কী? এবং একজন মুসলিমের জন্য এর গুরুত্ব কী?

কেয়ামতের ছোট ও বড় আলামতগুলো কী কী? এবং একজন মুসলিমের জন্য এর গুরুত্ব কী?

কেয়ামত (الساعة) হলো সেই মহাদিন, যেদিন এই বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলা সকল মৃত মানুষকে পুনরুত্থিত করে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। এই মহাদিন সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিছু আলামত বা লক্ষণ প্রকাশ পাবে, যা ছোট ও বড় এই দুই ভাগে বিভক্ত।

কেয়ামতের ছোট আলামতসমূহ (علامات الساعة الصغرى):

ছোট আলামতগুলো কেয়ামতের পূর্বে দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকবে। এর কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো:

১. **নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন:** তিনি সর্বশেষ নবী এবং তাঁর আগমনের মাধ্যমেই নবুওয়তের ধারা সমাপ্ত হয়েছে। এটি কেয়ামতের একটি বড় আলামত হলেও, এর প্রকাশ অন্যান্য ছোট আলামতের পূর্বে হয়েছে।

২. **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত:** এটিও কেয়ামতের নিকটবর্তী হওয়ার একটি লক্ষণ।

৩. **বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়:** সাহাবায়ে কেরামের যুগে এটি সংঘটিত হয়েছে।

৪. **বিপদ-আপদ ও ফেতনা বৃদ্ধি:** বিভিন্ন ধরনের ফিতনা, বিশৃঙ্খলা, রক্তপাত ও অন্যায়-অবিচার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে।

৫. **জ্ঞান হ্রাস ও মূর্খতা বৃদ্ধি:** দ্বীনি জ্ঞান কমে যাবে এবং অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বিস্তার লাভ করবে।

৬. **মদ্যপান ও ব্যভিচার বৃদ্ধি:** সমাজে ব্যাপকভাবে মদ্যপান ও অবৈধ যৌন সম্পর্ক প্রসার লাভ করবে।

৭. **সময় সংকুচিত হয়ে আসা:** সময়ের বরকত কমে যাবে এবং দ্রুত সবকিছু শেষ হয়ে যাবে বলে মনে হবে।

৮. **প্রাচুর্য বৃদ্ধি ও যাকাত কমে যাওয়া:** সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, তবে মানুষ কৃপণ হবে এবং যাকাত আদায়ে অনীহা দেখাবে।

৯. **বিশ্বাসঘাতকতা বৃদ্ধি ও আমানত নষ্ট হওয়া:** মানুষের মধ্যে বিশ্বাস কমে যাবে এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখা দেবে।

১০. **আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া:** মানুষ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে না।

১১. **হঠাৎ মৃত্যুর হার বৃদ্ধি:** অল্প বয়সে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাবে।

১২. **মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পুরুষের সংখ্যা হ্রাস:** যুদ্ধ ও অন্যান্য কারণে সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

১৩. **ছোটদের শাসন ও বড়দের সম্মান কমে যাওয়া:** অল্প বয়স্ক ও অনভিজ্ঞ লোকেরা নেতৃত্ব দেবে এবং বয়স্ক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সম্মান কমে যাবে।

১৪. **মসজিদ জাঁকজমকপূর্ণ করা, তবে হেদায়েত কমে যাওয়া:** মসজিদ বাহ্যিকভাবে সুন্দর ও সজ্জিত হবে, কিন্তু সেখানে প্রকৃত দ্বীনি শিক্ষা ও হেদায়েত কম থাকবে।

১৫. **গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রসার:** গান, বাদ্যযন্ত্র ও অশ্লীল বিনোদনের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

১৬. **সুদ ও ঘুষের ব্যাপকতা:** সমাজে সুদ ও ঘুষের লেনদেন স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হবে।

১৭. **বৃষ্টির স্বল্পতা ও ফসলের অভাব:** অনাবৃষ্টি ও খরা দেখা দেবে এবং কৃষিজ উৎপাদন কমে যাবে।

১৮. **পশু-পাখি ও জড় পদার্থের সাথে মানুষের কথা বলা:** আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়নকে এর একটি ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হয়।

১৯. **আরবের ভূমি পুনরায় সবুজ ও নদ-নদীপূর্ণ হওয়া:** বর্তমানে মরুভূমি হলেও ভবিষ্যতে এর পরিবর্তন ঘটবে।

২০. **ইউফ্রেটিস নদীর স্বর্ণের পাহাড় উন্মোচিত হওয়া:** এটি একটি বড় ফিতনা হবে এবং মানুষ এর লোভে পড়ে ধ্বংস হবে।

কেয়ামতের বড় আলামতসমূহ (علامات الساعة الكبرى):

বড় আলামতগুলো কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দ্রুত ও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাবে। এগুলো হলো:

১. **দাজ্জালের আবির্ভাব (خروج الدجال):** দাজ্জাল হবে এক ভয়ানক ফিতনা, যে পৃথিবীতে এসে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করবে এবং অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দেখাবে।

২. **ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ (نزول عيسى ابن مريم):** ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে দামেশকের একটি মসজিদের মিনারে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

৩. **ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাব (خروج يأجوج ومأجوج):** এরা হবে বিশাল এক মানবগোষ্ঠী, যারা পৃথিবীতে এসে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে।

৪. **ধোঁয়ার আবির্ভাব (ظهور الدخان):** আকাশ থেকে ঘন ধোঁয়া নেমে আসবে এবং তা অবিশ্বাসীদের জন্য কঠিন শাস্তি হবে।

৫. **সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া (طلوع الشمس من مغربها):** এটি সংঘটিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

৬. **দাব্বাতুল আরদ-এর আবির্ভাব (خروج الدابة):** মাটি থেকে এক অদ্ভুত প্রাণী বের হবে এবং মানুষের সাথে কথা বলবে, মুমিন ও কাফিরদের চিহ্নিত করবে।

৭. **তিনটি বড় ভূমিধস (ثلاثة خسوف عظيمة):** একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে এবং একটি আরব উপদ্বীপে সংঘটিত হবে।

৮. **আগুন যা মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্র করবে (نار تحشر الناس):** ইয়েমেন থেকে একটি আগুন বের হবে এবং মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

একজন মুসলিমের জন্য এর গুরুত্ব:

কেয়ামতের আলামতগুলোর জ্ঞান একজন মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

১. **ঈমান বৃদ্ধি:** এই আলামতগুলো সম্পর্কে জানার মাধ্যমে আল্লাহর কুদরত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আজ থেকে ১৪০০

বছরেরও বেশি সময় আগে এসব ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যা বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে বা হওয়ার পথে।

২. **সতর্কতা ও প্রস্তুতি:** কেয়ামতের নিকটবর্তী আলামতগুলো মুমিনকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করে। যখন একজন মুসলিম জানতে পারে যে কেয়ামত নিকটবর্তী, তখন সে তার আমলকে পরিশুদ্ধ করে, বেশি বেশি সৎ কাজ করে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।

৩. **ফেতনা থেকে সুরক্ষা:** ছোট ও বড় ফিতনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে একজন মুসলিম সেইসব ফিতনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে এবং সঠিক পথে অবিচল থাকতে পারে।

৪. **ধৈর্য ও দৃঢ়তা:** যখন একজন মুসলিম জানতে পারে যে কেয়ামতের পূর্বে কঠিন পরিস্থিতি ও পরীক্ষা আসবে, তখন সে ধৈর্য ধারণ করতে এবং ঈমানের উপর দৃঢ় থাকতে প্রস্তুত হয়।

৫. **আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন:** কেয়ামতের আলামতগুলো মানুষকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব এবং আখিরাতের চিরস্থায়ীত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ফলে মানুষ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চায়।

৬. **রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি:** রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান আরও বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর সুন্নাহর অনুসরণে আরও বেশি আগ্রহী হয়।

পরিশেষে বলা যায়, কেয়ামতের আলামতগুলোর জ্ঞান একজন মুসলিমের ঈমানকে মজবুত করে, আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহিত করে এবং ফিতনা থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এই আলামতগুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখা এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করা।

(٣٤) ما هو الشفاعة؟ ومن هم الشافعون يوم القيامة؟

শাফা'আত (সুপারিশ) কী? এবং কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী কারা হবেন?

শাফা'আত (الشفاعة) কী? এবং কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী কারা হবেন?

শাফা'আত (الشفاعة) কী?

শাফা'আত (الشفاعة) আভিধানিক অর্থে সুপারিশ করা, অনুরোধ করা, কারো পক্ষে কথা বলা বা সাহায্য চাওয়াকে বোঝায়।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, শাফা'আত (الشفاعة يوم القيامة) হলো কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার অনুমতি সাপেক্ষে কিছু বিশেষ ব্যক্তি গুনাহগার মুমিনদের শাস্তি হ্রাস করা, জান্নাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা অথবা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন।

শাফা'আত মূলত আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। তিনি তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে এই সম্মান দান করবেন যে তারা তাঁর কাছে অন্যদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি পাবেন। তবে মনে রাখতে হবে, শাফা'আতের চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউই সুপারিশ করতে পারবে না।

কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী কারা হবেন?

কিয়ামতের দিন বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিগণ আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ করার সম্মান লাভ করবেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (صلى الله عليه وسلم): তিনি হবেন সকল সুপারিশকারীর সরদার এবং মহান সুপারিশকারী (الشافع المشفع)। তাঁর সবচেয়ে বড় সুপারিশ হলো "শাফা'আতে কুবরা" (الشفاعة الكبرى), যা তিনি সেদিন হিসাব শুরু করার জন্য করবেন, যখন সকল মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে কঠিন অবস্থায় অপেক্ষায় থাকবে। এছাড়াও তিনি তাঁর উম্মতের গুনাহগারদের জন্য বিভিন্ন প্রকার সুপারিশ করবেন, যেমন - যাদের গুনাহের কারণে জাহান্নাম অবধারিত হয়েছে তাদের জন্য সুপারিশ করা যেন তারা জাহান্নামে প্রবেশ না করে, জাহান্নামে প্রবেশকারীদের শাস্তি হ্রাস করার জন্য সুপারিশ করা এবং যাদের সৎ আমল বেশি তাদের জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য সুপারিশ করা।

২. ফেরেশতাগণ (الملائكة): আল্লাহর অনেক সম্মানিত ফেরেশতাও কিয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য সুপারিশ করবেন। কুরআনে এর উল্লেখ রয়েছে।

৩. নবীগণ (الأنبياء): অন্যান্য নবীগণও তাঁদের উম্মতের মধ্যে যারা ঈমান এনেছেন এবং গুনাহগার, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন।

৪. সিদ্দীকগণ (الصديقون): যারা ঈমানের ক্ষেত্রে নবীদের পরেই সর্বোচ্চ স্তরের, তারাও সুপারিশ করার সম্মান লাভ করবেন।

৫. শহীদগণ (الشهداء): আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী শহীদগণকেও সুপারিশ করার অধিকার দেওয়া হবে।

৬. সৎকর্মশীল মুমিনগণ (المؤمنون الصالحون): সাধারণ মুমিনদের মধ্যেও যারা সৎকর্মপরায়ণ এবং আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন, তারাও তাদের পরিচিত ও প্রিয়জনদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন। হাদীসে এসেছে, একজন মুমিন তার প্রতিবেশী, বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের জন্য সুপারিশ করবে।

৭. ছোট শিশুরা (الأطفال الصغار): মুসলিম শিশুদের যারা সাবালক হওয়ার আগেই মারা গেছে, তারাও তাদের পিতামাতার জন্য সুপারিশ করবে, যদি তাদের পিতামাতা ধৈর্য ধারণ করে থাকেন।

শাফা'আতের শর্ত:

শাফা'আত কার্যকর হওয়ার জন্য দুটি প্রধান শর্ত রয়েছে:

১. আল্লাহর অনুমতি (إذن الله): আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। কুরআনে বলা হয়েছে: **"কে আছে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করার সাহস রাখে?"** (সূরা আল-বাকারা: ২৫৫)

২. সুপারিশকৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি (رضا الله عن المشفوع له): আল্লাহ তা'আলা কেবল তাদের জন্যই সুপারিশ কবুল করবেন যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। কুরআনে বলা হয়েছে: **"এবং তারা শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট"**। (সূরা আল-আনবিয়া: ২৮)

গুরুত্ব:

শাফা'আতের বিশ্বাস মুমিনদের জন্য আশা ও ভরসার উৎস। তারা জানতে পারে যে কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ তা'আলার দয়ায় এমন কিছু সম্মানিত ব্যক্তি থাকবেন যারা তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবেন। তবে

এই বিশ্বাসের সাথে সাথে সৎ আমল করা, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করাও অপরিহার্য। কারণ আল্লাহর অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত কারো সুপারিশ কাজে আসবে না।
আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আত নসীব করেন এবং কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করেন। আমীন।

(٣٥) ما هو الحساب والميزان والصراط؟ وما هي عقيدة أهل السنة في هذه الأمور؟

হিসাব, মিযান (দাঁড়িপাল্লা) ও সিরাত কী? এবং এই বিষয়গুলোতে আহলুস সুন্নাহর আকীদা কী?

হিসাব, মিযান (দাঁড়িপাল্লা) ও সিরাত কী? এবং এই বিষয়গুলোতে আহলুস সুন্নাহর আকীদা কী?

হিসাব (الحساب):

হিসাব (الحساب) অর্থ হলো হিসাব নেওয়া, গণনা করা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল বান্দার কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। মানুষ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ভালো বা মন্দ কাজ করেছে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তার প্রতিদান দেওয়া হবে। এই হিসাব কারো জন্য সহজ হবে, আবার কারো জন্য কঠিন হবে।

আহলুস সুন্নাহর আকীদা: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই বান্দাদের হিসাব নেবেন। কুরআন ও সুন্নাহর বহু স্পষ্ট দলীল দ্বারা এটি প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "**আজকের দিনে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে। আজ কোনো যুলুম করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী**।" (সূরা গাফির: ১৭)

মিযান (الميزان):

মিযান (الميزان) অর্থ হলো দাঁড়িপাল্লা, ওজন করার যন্ত্র। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের আমল ওজন করার জন্য এক বিশাল ও ন্যায়পরায়ণ দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবেন। মানুষের ভালো ও মন্দ কাজগুলো ওজন করা হবে এবং যার পাল্লা ভারী হবে সে সফলকাম হবে, আর যার পাল্লা হালকা হবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আহলুস সুন্নাহর আকীদা: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো কিয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্য প্রকৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। এই দাঁড়িপাল্লার দুটি পাল্লা থাকবে এবং আমলসমূহকে (যদিও তা দৃশ্যমান নয়) আল্লাহর ইচ্ছায় ওজন করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "**আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। যদি কারো সরিষার দানা পরিমাণও কর্ম থাকে, তবে আমি তা উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট**।" (সূরা আল-আনবিয়া: ৪৭)

সিরাত (الصراط):

সিরাত (الصراط) অর্থ হলো পথ, রাস্তা। কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি সরু সেতু স্থাপন করা হবে, যা জান্নাতের দিকে যাবে। সকল মানুষকে এই সেতুর উপর দিয়ে পার হতে হবে। মুমিনগণ তাদের

ঈমান ও আমলের আলোয় দ্রুত গতিতে এই সেতু পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর কাফির ও মুনাফিকরা তাদের অন্ধকার ও পাপের কারণে জাহান্নামে পতিত হবে।

আহলুস সুন্নাহর আকীদা: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি সেতু থাকবে, যার নাম সিরাত। সকল মানুষকেই এর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। এটি চুলের চেয়েও চিকন এবং তরবারির চেয়েও ধারালো হবে। মানুষের আমল অনুযায়ী তাদের চলার গতি নির্ধারিত হবে। যারা পৃথিবীতে সরল পথে (সিরাতুল মুস্তাকীম) চলেছে, তারা সেদিন সহজেই পার হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সিরাতের বর্ণনা দিয়েছেন এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

এই বিষয়গুলোতে আহলুস সুন্নাহর সামগ্রিক আকীদা:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ হিসাব, মিযান ও সিরাতের উপর ঈমান রাখে এবং বিশ্বাস করে যে এগুলো কিয়ামতের দিনের অপরিহার্য অংশ। এই বিষয়গুলো আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচার, তাঁর ক্ষমতা ও তাঁর বান্দাদের প্রতিদান ও শাস্তির বাস্তব প্রমাণ।

- তারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের ছোট-বড় সকল কাজের হিসাব নেবেন।
- তারা বিশ্বাস করে যে আমল ওজন করার জন্য ন্যায়পরায়ণ দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে।
- তারা বিশ্বাস করে যে জান্নাতে যাওয়ার জন্য জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি সেতু থাকবে, যা সিরাত নামে পরিচিত এবং মুমিন ও কাফির সকলেই তা অতিক্রম করবে।

এই বিশ্বাসগুলো একজন মুসলিমকে তার দুনিয়াবী জীবনে সৎকর্ম করতে, গুনাহ থেকে বাঁচতে এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করে। কারণ কিয়ামতের দিন তার প্রতিটি কাজের হিসাব নেওয়া হবে এবং সে অনুযায়ী প্রতিদান বা শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের হিসাব সহজ করেন, আমাদের নেক আমলের পাল্লা ভারী করেন এবং সিরাত পার হওয়ার তাওফিক দান করেন। আমীন।

(٣٦) ما هي الجنة؟ وما هي النعيم الذي أعده الله للمؤمنين فيها؟

জান্নাত কী? এবং আল্লাহ তাতে মুমিনদের জন্য যে নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন তা কী কী?

জান্নাত কী? এবং আল্লাহ তাতে মুমিনদের জন্য যে নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন তা কী কী?

জান্নাত (الجنة) কী?

জান্নাত (الجنة) হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুমিন, পরহেজগার ও সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য প্রতিশ্রুত চিরস্থায়ী আবাসস্থল। এটি এমন এক স্থান, যেখানে কোনো দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোক বা মৃত্যু নেই। জান্নাত সকল প্রকার আরাম, আনন্দ, শান্তি ও সৌন্দর্যের আধার। এটি এমন সব নেয়ামতে পরিপূর্ণ যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয় কল্পনাও করতে পারেনি।

কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে জান্নাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও নেয়ামতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। জান্নাত বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত, যা মুমিনদের ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। সর্বোচ্চ জান্নাত হলো জান্নাতুল ফিরদাউস।

আল্লাহ তাতে মুমিনদের জন্য যে নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন তা কী কী?

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে মুমিনদের জন্য অসংখ্য নেয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন, যার কিছু বিবরণ কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত হলো:

১. **চিরস্থায়ী জীবন:** জান্নাতে প্রবেশকারীগণ চিরকাল সেখানে বসবাস করবে, তাদের আর মৃত্যু হবে না।

২. **অনন্ত যৌবন:** জান্নাতবাসীরা সর্বদা যুবক থাকবে, তাদের বয়স বাড়বে না এবং তারা দুর্বল হবে না।

৩. **নিষ্কলুষ হৃদয়:** জান্নাতবাসীদের অন্তর হিংসা, বিদ্বেষ ও সকল প্রকার খারাপ অনুভূতি থেকে মুক্ত থাকবে। তাদের হৃদয় হবে নির্মল ও পবিত্র।

৪. **পবিত্র সঙ্গী:** জান্নাতে মুমিনদের জন্য পবিত্র ও সুন্দরী স্ত্রীগণ (হুর) থাকবেন, যারা সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত।

5. **মনোমুগ্ধকর প্রাসাদ ও বাসস্থান:** জান্নাতীদের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমুক্তাখচিত প্রাসাদ এবং মনোরম বাসস্থান তৈরি করা হয়েছে।
6. **বহুবিধ ফল ও খাদ্য:** জান্নাতে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ফল ও খাদ্যের প্রাচুর্য থাকবে, যা তারা ইচ্ছামতো গ্রহণ করতে পারবে।
7. **পবিত্র পানীয়:** জান্নাতে বিভিন্ন প্রকার পবিত্র পানীয়ের নহর প্রবাহিত হবে, যেমন - বিশুদ্ধ পানির নহর, সুস্বাদু দুধের নহর, সুগন্ধিযুক্ত শরাবের নহর (যা দুনিয়ার শরাবের মতো নেশা সৃষ্টিকারী নয়) এবং স্বচ্ছ মধুর নহর।
8. **আরামদায়ক পোশাক ও অলংকার:** জান্নাতবাসীরা রেশমের পোশাক পরিধান করবে এবং স্বর্ণ ও মুক্তার অলংকার দ্বারা সজ্জিত হবে।
9. **উত্তম সান্নিধ্য:** জান্নাতে মুমিনগণ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীলদের সাথে অবস্থান করার সুযোগ পাবে।
10. **আল্লাহর দর্শন:** জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো আল্লাহ তা'আলার দিদার (দর্শন) লাভ করা। মুমিনগণ তাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষভাবে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করবে, যা হবে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় আনন্দ ও পরিতৃপ্তি।
11. **আল্লাহর সন্তুষ্টি:** আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের উপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না।
12. **সকল প্রকার অভাব ও কষ্টের অনুপস্থিতি:** জান্নাতে কোনো প্রকার অভাব, কষ্ট, দুঃখ, ক্লান্তি বা বিরক্তি থাকবে না। সবকিছু হবে পরিপূর্ণ ও আনন্দময়।
13. **ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু লাভ:** জান্নাতবাসীরা যা চাইবে তাই পাবে। তাদের কোনো চাওয়া অপূর্ণ থাকবে না।
14. **উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান:** জান্নাতবাসীদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দান করা হবে।
15. **নিত্যনতুন নেয়ামত:** জান্নাতের নেয়ামতসমূহ কখনো শেষ হবে না, বরং তা সর্বদা নতুন ও সতেজ থাকবে।

এইগুলো জান্নাতের অগণিত নেয়ামতের সামান্য উদাহরণ মাত্র। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন যা মানুষের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। আমাদের উচিত ঈমানের উপর অবিচল থাকা এবং সৎকর্মের মাধ্যমে জান্নাত লাভের চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন। আমীন।

(৩৭) ما هي النار؟ وما هو العذاب الذي أعده الله للكافرين والعصاة فيها؟

জাহান্নাম কী? এবং আল্লাহ তাতে কাফির ও পাপীদের জন্য যে শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন তা কী কী?

জাহান্নাম কী? এবং আল্লাহ তাতে কাফির ও পাপীদের জন্য যে শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন তা কী কী?

জাহান্নাম (النار) কী?

জাহান্নাম (النار) হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কাফির (অবিশ্বাসী), মুশরিক (আল্লাহর সাথে শরীককারী) এবং গুরুতর পাপী বান্দাদের জন্য প্রতিশ্রুত চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী শাস্তির স্থান। এটি এমন এক ভয়াবহ স্থান, যেখানে কঠিনতম শাস্তি, অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে জাহান্নামের ভয়াবহতা ও তাতে বিদ্যমান শাস্তির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যা পাপের গভীরতা ও প্রকারভেদের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে।

আল্লাহ তাতে কাফির ও পাপীদের জন্য যে শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন তা কী কী?

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে কাফির ও পাপীদের জন্য বিভিন্ন প্রকার ভয়ানক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন, যার কিছু বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. **ভয়াবহ আগুন:** জাহান্নামের আগুন হবে অত্যন্ত তীব্র ও প্রখর। দুনিয়ার আগুন তার তুলনায় কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "**যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন; তাদেরকে মৃত্যু দেওয়া হবে না যে তারা মরবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে প্রতিফল দেই**।" (সূরা ফাতির: ৩৬)

২. **তপ্ত পানি:** জাহান্নামীদেরকে ফুটন্ত পানি পান করতে দেওয়া হবে, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "**তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানি এবং পুঁজ; তারা তা পান করবে এবং গলাধঃকরণ করতে পারবে না। আর তাদের কাছে আসবে সব দিক থেকে মৃত্যু, কিন্তু তারা মরবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে আরও কঠোর শাস্তি**।" (সূরা ইবরাহীম: ১৭)

৩. **যন্ত্রণাদায়ক খাদ্য:** জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যাক্কুম নামক এক প্রকার বিষাক্ত বৃক্ষের ফল, যা তাদের পেটে গিয়ে মারাত্মক যন্ত্রণা সৃষ্টি করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "**নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ পাপীদের খাদ্য হবে। গলিত তামার ন্যায়, তা পেটের মধ্যে টগবগ করবে - যেমন টগবগ করে ফুটন্ত পানি**।" (সূরা আদ-দুখান: ৪৩-৪৬)

৪. **আগুনের পোশাক:** কাফিরদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "**অতএব যারা কুফরী করে, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে; তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে**

দেওয়া হবে। তাতে তাদের পেটের ভেতরের সবকিছু এবং চামড়া গলে যাবে। আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি।" (সূরা আল-হাজ্জ: ১৯-২২)

5. **কঠোর শাস্তি ও লাঞ্ছনা:** জাহান্নামীদেরকে প্রতিনিয়ত কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "**সেদিন কাফিরদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। তাদের সামনে ও পিছনে রয়েছে জাহান্নাম।**" (সূরা আল-বুরুজ: ১০)
6. **চিরস্থায়ী আবাস:** কাফির ও মুশরিকদের জন্য জাহান্নাম হবে চিরস্থায়ী আবাসস্থল। তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে শাস্তি ভোগ করবে এবং কখনো মুক্তি পাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "**নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।**" (সূরা আল-বাকারাহ: ৩৯)
7. **নিরাশ ও অনুতাপ:** জাহান্নামীরা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করবে এবং মুক্তির জন্য আর্তনাদ করবে, কিন্তু তাদের কোনো আর্তনাদ শোনা হবে না এবং তারা নিরাশ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "**আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর তোমাদের উপর শাস্তি আসার পূর্বে; এরপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।**" (সূরা আয-যুমার: ৫৪)
8. **ফেরেশতাদের কঠোর আচরণ:** জাহান্নামের পাহারাদার ফেরেশতারা হবে অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম। তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে কোনো প্রকার শৈথিল্য দেখাবে না এবং জাহান্নামীদের উপর কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "**হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর; তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর হৃদয় ও শক্তিশালী ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহ যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে।**" (সূরা আত-তাহরীম: ৬)
9. **পরস্পরের উপর দোষারোপ:** জাহান্নামীরা একে অপরের উপর দোষ চাপাবে এবং একে অপরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করবে।
10. **আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত:** জাহান্নামীরা আল্লাহ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে।

এইগুলো জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির সামান্য বিবরণ মাত্র। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুফরী ও সকল প্রকার গুনাহ থেকে রক্ষা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দান কর। আমীন।

(٣٨) ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الفرق الضالة والمبتدعة؟

ভ্রান্ত ও বিদ'আতী দলগুলোর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'তের অবস্থান কী?

ভ্রান্ত ও বিদ'আতী দলগুলোর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'তের অবস্থান কী?

ভ্রান্ত ও বিদ'আতী দলগুলোর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'তের অবস্থান কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট। তাদের মূলনীতি হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি উভয়টি পরিহার করা। এই দলগুলোর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর অবস্থান সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. **তাদের ভ্রান্ত আকীদা ও বিদ'আতকে প্রত্যাখ্যান করা:** আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত দৃঢ়ভাবে ঐ সকল আকীদা ও বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে যা কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের বুঝ এবং সালাফে সালেহীনদের পদ্ধতির বিরোধী। তারা স্পষ্ট ভাষায় ঐ সকল বিদ'আত ও নব-প্রবর্তিত প্রথাকে ভুল ও পথভ্রষ্টতা হিসেবে চিহ্নিত করে, যা দ্বীনের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

২. **তাদের থেকে দূরে থাকা এবং তাদের অনুসরণ না করা:** আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তাদের অনুসারীদেরকে ভ্রান্ত ও বিদ'আতী দলগুলোর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার এবং তাদের অনুসরণ না করার উপদেশ দেয়। কারণ তাদের অনুসরণ ঈমান ও আমলের জন্য ক্ষতিকর এবং পথভ্রষ্টতার কারণ হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "**আর যখন তুমি দেখবে তাদেরকে যারা আমার আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে, তখন তুমি তাদের থেকে সরে যাও যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসো না।**" (সূরা আল-আন'আম: ৬৮)

৩. **তাদের ভুলগুলো স্পষ্ট করে মানুষের কাছে তুলে ধরা:** আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'তের উলামাগণ কুরআন ও সুন্নাহর দলিলের মাধ্যমে ভ্রান্ত দলগুলোর ভুল আকীদা ও বিদ'আতগুলো জনসমক্ষে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন, যাতে সাধারণ মানুষ তাদের প্রতারণা থেকে বাঁচতে পারে। এটি দ্বীনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৪. **তাদের সাথে বিতর্ক ও আলোচনা করা, তবে হিকমত ও উত্তম পন্থায়:** যদি তাদের সংশোধনের আশা থাকে, তবে আহলুস সুন্নাহর বিদ্বানগণ তাদের সাথে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও বিতর্ক করতে পারেন, তবে তা অবশ্যই হিকমত (প্রজ্ঞা) ও উত্তম পন্থায় হতে হবে, যাতে সত্য স্পষ্ট হয় এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "**তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায়।**" (সূরা আন-নাহল: ১২৫)

5. **তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা, যতক্ষণ না তারা কুফরী করে:** ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা বা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়, যতক্ষণ না তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস কুফরীর পর্যায়ে পৌঁছে। তাদের জন্য হেদায়েতের দু'আ করা যেতে পারে। তবে তাদের ভ্রান্ত আকীদা ও কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা ঈমানের অংশ।
6. **তাদেরকে মুসলিম উম্মাহর অংশ হিসেবে গণ্য না করা, যদি তাদের আকীদা কুফরীর পর্যায়ে পৌঁছে:** যদি কোনো দলের আকীদা ও বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতিগুলোর বিরোধী হয় এবং কুফরীর পর্যায়ে পৌঁছে, তবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তাদেরকে মুসলিম উম্মাহর অংশ হিসেবে গণ্য করে না।
7. **তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, যদি তারা ফিতনা সৃষ্টি করে ও মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে:** যদি কোনো ভ্রান্ত দল ফিতনা সৃষ্টি করে, সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে এবং মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে শরীয়তসম্মত পন্থায় জিহাদ করা ওয়াজিব হতে পারে।

সারসংক্ষেপ:

ভ্রান্ত ও বিদ'আতী দলগুলোর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'তের অবস্থান হলো তাদের ভুল আকীদা ও বিদ'আতকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রত্যাখ্যান করা, তাদের থেকে দূরে থাকা, তাদের ভুলগুলো মানুষের কাছে স্পষ্ট করা, হিকমত ও উত্তম পন্থায় তাদের সাথে আলোচনা করা, যতক্ষণ না তারা কুফরী করে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা এবং প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে শরীয়তসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এবং দ্বীনের মূলনীতিতে দৃঢ় থাকে।

(٣٩) ما هي أهمية دراسة علم العقيدة للمسلم؟ وما هي الثمرات التي يجنيها من ذلك؟

একজন মুসলিমের জন্য ইলমে আকীদা (বিশ্বাসতত্ত্ব) অধ্যয়নের গুরুত্ব কী? এবং এর মাধ্যমে সে কী ফল লাভ করে?

একজন মুসলিমের জন্য ইলমে আকীদা (বিশ্বাসতত্ত্ব) অধ্যয়নের গুরুত্ব কী? এবং এর মাধ্যমে সে কী ফল লাভ করে?

একজন মুসলিমের জন্য ইলমে আকীদা (ইসলামী বিশ্বাসতত্ত্ব) অধ্যয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। এটি ইসলামের ভিত্তি এবং একজন মুসলিমের ঈমানের মূল স্তম্ভ। এর গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর মাধ্যমে একজন মুসলিম বহুবিধ ফল লাভ করে।

ইলমে আকীদা অধ্যয়নের গুরুত্ব:

১. **ঈমানের ভিত্তি সুদৃঢ়করণ:** আকীদা হলো ইসলামের মূল ভিত্তি। সঠিক আকীদা ব্যতীত কোনো আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ইলমে আকীদা অধ্যয়নের মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লাহর পরিচয়, তাঁর গুণাবলী, তাঁর একত্ববাদ, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, তাকদীর এবং আখিরাতের জীবনের সঠিক জ্ঞান লাভ করে, যা তার ঈমানের ভিত্তি সুদৃঢ় করে।

২. **শিরক ও বিদ'আত থেকে সুরক্ষা:** ইলমে আকীদা অধ্যয়নের মাধ্যমে একজন মুসলিম শিরক (আল্লাহর সাথে শরীক করা) ও বিদ'আত (দ্বীনের মধ্যে নব উদ্ভাবন) সম্পর্কে জানতে পারে এবং তা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। শিরক হলো সবচেয়ে বড় গুনাহ এবং বিদ'আত পথভ্রষ্টতার কারণ। সঠিক আকীদার জ্ঞান একজন মুসলিমকে এই মারাত্মক ভুলগুলো থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

৩. **সঠিক ইবাদত পদ্ধতি:** আল্লাহর সঠিক ইবাদত করার জন্য সঠিক আকীদার জ্ঞান অপরিহার্য। ইলমে আকীদা একজন মুসলিমকে জানতে সাহায্য করে যে কিভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে এবং কোন ধরনের ইবাদত শরীয়তে গ্রহণযোগ্য।

৪. **মানসিক প্রশান্তি ও স্থিরতা:** সঠিক আকীদার জ্ঞান একজন মুসলিমকে মানসিক প্রশান্তি ও স্থিরতা দান করে। যখন একজন মুসলিম আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখে এবং তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষায় সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে এবং হতাশ হয় না।

5. **সঠিক জীবনযাপন:** আকীদা একজন মুসলিমের জীবনের সকল দিককে প্রভাবিত করে। সঠিক আকীদার জ্ঞান তাকে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে, ফলে সে একটি নীতি-ভিত্তিক ও আল্লাহ-সন্তুষ্ট জীবনযাপন করতে পারে।

6. **ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভ:** ইলমে আকীদা হলো ইসলামের অন্যান্য জ্ঞানের চাবিকাঠি। আকীদার জ্ঞান ব্যতীত কুরআন, হাদীস ও শরীয়তের অন্যান্য বিধি-বিধানের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন।
7. **দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ:** সঠিক আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত জীবন দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে কল্যাণ বয়ে আনে। দুনিয়াতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে এবং আখিরাতে জান্নাতের অধিকারী হয়।

ইলমে আকীদা অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত ফল:

১. **বিশুদ্ধ ঈমান:** ইলমে আকীদা অধ্যয়নের প্রধান ফল হলো বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত ঈমান লাভ করা, যা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য।

২. **আল্লাহর সন্তুষ্টি:** সঠিক আকীদার উপর আমল করার মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

৩. **জান্নাত লাভ:** বিশুদ্ধ ঈমান ও সৎ আমল জান্নাত লাভের প্রধান উপায়। ইলমে আকীদা এই পথের দিশা দেয়।

৪. **জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি:** শিরক ও বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে একজন মুসলিম জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে।

5. **অন্তরের দৃঢ়তা:** সঠিক আকীদার জ্ঞান অন্তরে দৃঢ়তা সৃষ্টি করে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে সাহায্য করে।
6. **উত্তম চরিত্র:** বিশুদ্ধ আকীদা একজন মুসলিমকে উত্তম চরিত্র গঠনে সাহায্য করে, কারণ সে জানে যে আল্লাহ তাকে দেখছেন এবং তার প্রতিটি কাজের হিসাব নেবেন।
7. **উম্মাহর ঐক্য:** সঠিক আকীদার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া মুসলিম উম্মাহর সংহতি ও শক্তির মূল ভিত্তি। ইলমে আকীদা এই ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা যায়, একজন মুসলিমের জন্য ইলমে আকীদা অধ্যয়ন করা অত্যাবশ্যকীয়। এর মাধ্যমে সে তার ঈমানকে পরিশুদ্ধ করে, সঠিক পথে পরিচালিত হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করে। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত সালাফে সালেহীনদের (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের) বিশুদ্ধ আকীদা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করা।

(٤٠) كيف يمكن للمسلم أن يحافظ على عقيدته من الشبهات والفتن؟

একজন মুসলিম কিভাবে তার আকীদা (বিশ্বাস) কে সন্দেহ ও ফেতনা থেকে রক্ষা করতে পারে?

একজন মুসলিম কিভাবে তার আকীদা (বিশ্বাস) কে সন্দেহ ও ফেতনা থেকে রক্ষা করতে পারে?

একজন মুসলিম তার আকীদা (বিশ্বাস) কে সন্দেহ ও ফেতনা থেকে রক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারে:

১. **ইলমে আকীদা (বিশ্বাসতত্ত্ব) গভীরভাবে অধ্যয়ন করা:** কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহীনদের (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের) বিশুদ্ধ আকীদা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা। আকীদার মূলনীতিগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে সন্দেহ ও ফেতনা মোকাবেলা করা সহজ হয়।

২. **কুরআন ও সুন্নাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা:** নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা, এর অর্থ ও ব্যাখ্যা অনুধাবন করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীস অধ্যয়ন করা ও তার অনুসরণ করা। কুরআন ও সুন্নাহ হলো আকীদার মূল উৎস এবং সকল প্রকার সন্দেহ ও ফেতনার সুস্পষ্ট সমাধান এতে বিদ্যমান।

৩. **জ্ঞানবান ও নির্ভরযোগ্য আলেমদের সংস্পর্শে থাকা:** যারা বিশুদ্ধ আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞান রাখেন, এমন আলেমদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, তাদের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ নেওয়া। কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন возник হলে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে সমাধান করে নেওয়া।

৪. **সন্দেহপূর্ণ বিষয় ও ফেতনা সৃষ্টিকারী উৎস থেকে দূরে থাকা:** সন্দেহ উদ্রেককারী বই, ওয়েবসাইট, আলোচনা বা সঙ্গ এড়িয়ে চলা। ফেতনা সৃষ্টিকারী বক্তা ও গোষ্ঠীর সংস্পর্শ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। কারণ মানুষের মন দুর্বল এবং সহজেই বিভ্রান্ত হতে পারে।

৫. **আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া (দু'আ):** আকীদা হিফাজতের জন্য আল্লাহর কাছে নিয়মিত দু'আ করা। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র হেদায়েত দানকারী এবং তিনিই বান্দাকে সকল প্রকার ফেতনা থেকে রক্ষা করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বিভিন্ন দু'আ করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও দু'আ করতে উৎসাহিত করতেন।

৬. **সৎকর্মশীলদের সঙ্গ লাভ করা:** নেককার ও দ্বীনদার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক রাখা, যারা ঈমানের উপর দৃঢ় এবং একে অপরকে সৎ পথে চলতে উৎসাহিত করে। সৎ সঙ্গ আকীদা মজবুত রাখতে সহায়ক।

7. **নিয়মিত আত্মসমালোচনা করা:** নিজের ঈমান ও আকীদা নিয়মিত পর্যালোচনা করা এবং কোনো প্রকার দুর্বলতা বা সন্দেহ দেখা দিলে দ্রুত তা দূর করার চেষ্টা করা।
8. **ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করা:** যখন কোনো সন্দেহ বা ফেতনা মনে উদয় হয়, তখন ধৈর্য ধারণ করা এবং তাড়াহুড়ো করে কোনো ভুল সিদ্ধান্তে না আসা। দৃঢ়তার সাথে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তার সমাধান খোঁজা।
9. **অধিক পরিমাণে ইবাদত করা:** নিয়মিত ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবাদত করা, যেমন - তাহাজ্জুদ, নফল রোজা, দান-সাদকা ইত্যাদি। ইবাদত অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে, যা আকীদা হিফাজতে সহায়ক।
10. **ইসলামের সৌন্দর্য ও যুক্তিসঙ্গত দিকগুলো অনুধাবন করা:** ইসলামের বিশ্বাস ও শরীয়তের বিধানগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করা এবং এর যৌক্তিকতা অনুধাবন করা। এতে আকীদার প্রতি বিশ্বাস আরও মজবুত হয় এবং সন্দেহ দূর হয়।
11. **সালাফে সালেহীনদের জীবনী অধ্যয়ন করা:** রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন এবং তাদের আকীদা ও আমল সম্পর্কে জানা। তাদের অনুসরণ করা আকীদা হিফাজতের সর্বোত্তম উপায়।

12. **ফেতনার সময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া:** যখন কোনো বড় ফেতনা বা পরীক্ষা সম্মুখীন হয়, তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা।

এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে একজন মুসলিম ইনশাআল্লাহ তার আকীদা (বিশ্বাস) কে সকল প্রকার সন্দেহ ও ফেতনা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে এবং সরল পথের উপর অবিচল থাকতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং আমাদের ঈমানকে দৃঢ় রাখুন। আমীন।

▪ খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: ৬টি থাকবে ৪টির উত্তর দিতে হবে: ৪×৫=২০

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নসমূহ:

١. هل الشفاعة حق لمرتكب الكبيرة من المسلمين؟ بين مدللا.

১. মুসলিমদের মধ্যে যে বড় পাপ করেছে, তার জন্য কি সুপারিশের অধিকার আছে? দলীলসহ বর্ণনা কর।

মুসলিমদের মধ্যে যে বড় পাপ করেছে, তার জন্য কি সুপারিশের অধিকার আছে? দলীলসহ বর্ণনা কর।

উত্তর: হ্যাঁ, মুসলিমদের মধ্যে যে বড় পাপ করেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার অনুমতি সাপেক্ষে তাদের জন্য সুপারিশের অধিকার আছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'তের বিশুদ্ধ আকীদা অনুযায়ী, বড় পাপকারী মুসলিম যদি ঈমানের উপর অবিচল থাকে এবং শিরক না করে মারা যায়, তবে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না। তার পাপের কারণে সে শাস্তি ভোগ করতে পারে, তবে সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন অথবা তার শাস্তি হ্রাস করতে পারেন।

দলিল:

কুরআন ও সুন্নাহর বহু দলীল দ্বারা বড় পাপকারী মুসলিমের জন্য সুপারিশের অধিকার প্রমাণিত হয়:

১. কুরআনের দলিল: * আল্লাহ তা'আলা বলেন: **" وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ"** (সূরা আয-যুখরুফ: ৮৬) (আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তারা ডাকে, তারা সুপারিশের অধিকারী নয়; তবে যারা সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তারা জানে।) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে যারা তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছে, তারা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ করতে পারবে। এর মধ্যে গুনাহগার মুমিনরাও অন্তর্ভুক্ত।

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

" يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا"

(সূরা ত্বাহা: ১০৯)

(সেদিন সুপারিশ কোনো উপকারে আসবে না, তবে রহমানের (আল্লাহর) অনুমতিপ্রাপ্ত এবং যার কথা তিনি পছন্দ করেন তার সুপারিশ ব্যতীত।)

এই আয়াতে সুপারিশের কার্যকারিতা আল্লাহর অনুমতি ও সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল বলা হয়েছে। আল্লাহ তাঁর রহমতে বড় পাপী মুমিনদের জন্য সুপারিশের অনুমতি দিতে পারেন।

২. **সুন্নাহর দলিল:** * রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **"شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي"** (সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৩৯, সুনানে তিরমিযী: ২৪৩৫) (আমার সুপারিশ আমার উম্মতের বড় পাপকারীদের জন্য।) এই সুস্পষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর উম্মতের ঐ সকল লোকদের জন্য সুপারিশ করবেন যারা বড় পাপ করেছে কিন্তু ঈমানের উপর মারা গেছে।

* আরও বহু হাদীসে শাফা'আতের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে, যেখানে নবী (সাঃ) এবং অন্যান্য সুপারিশকারীগণ গুনাহগার মুমিনদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনার জন্য সুপারিশ করবেন।

* আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

" يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهُمْ عَذَابٌ بِشَفَاعَتِي، كَانُوا يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ"

(সহীহ বুখারী: ৭৪১০)

(আমার সুপারিশের মাধ্যমে একদল লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে, যারা শাস্তি ভোগ করার পর 'জাহান্নামী' নামে পরিচিত হবে।)

এই হাদীস স্পষ্টভাবে বড় পাপী মুমিনদের জন্য সুপারিশের প্রমাণ বহন করে, যারা তাদের পাপের কারণে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

- শাফা'আত পাওয়ার জন্য তাওহীদের উপর অবিচল থাকা এবং শিরক থেকে মুক্ত থাকা অপরিহার্য।
- শাফা'আত আল্লাহর অনুমতি ও সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল।
- শাফা'আত গুনাহগার মুমিনদের জন্য একটি আশা, তবে এর উপর ভরসা করে পাপ কাজে লিপ্ত থাকা উচিত নয়। বরং সর্বদা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং সৎ আমল করা উচিত।

অতএব, দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় যে মুসলিমদের মধ্যে যে বড় পাপ করেছে, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি সাপেক্ষে তাদের জন্য সুপারিশের অধিকার আছে।

٢. هل عذاب القبر حق؟ بين عقيدة أهل السنة في المسئلة.

২. কবরের আযাব কি সত্য? এই বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকীদা বর্ণনা কর।

উত্তর: হ্যাঁ, কবরের আযাব (عذاب القبر) সত্য। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের দৃঢ় বিশ্বাস যে মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কবরে ভালো ও মন্দ উভয় প্রকার জীবন রয়েছে। নেককার ব্যক্তিরা কবরে শান্তি ও আরাম লাভ করবে, আর পাপী ও কাফিররা কবরে আযাব ও কষ্ট ভোগ করবে।

আহলুস সুন্নাহর আকীদা:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে কবরের আযাব ও নিয়ামতের উপর ঈমান রাখে। তাদের আকীদা হলো:

১. **কবরের জীবন সত্য:** মৃত্যুর পর মানুষের রূহ কবরে ফিরে আসে এবং সেখানে তাকে তার ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

২. **ফিরিশতাদের প্রশ্ন:** মুনকার ও নাকীর নামক দু'জন ফেরেশতা কবরে মৃত ব্যক্তিকে তার রব, তার দ্বীন এবং তার নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

৩. **কবরের আযাব ও নিয়ামত:** যারা এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে, তাদের কবর প্রশস্ত ও আলোকিত করে দেওয়া হবে এবং তারা জান্নাতের আরাম ও শান্তি অনুভব করবে। পক্ষান্তরে যারা উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে, তাদের কবর সংকীর্ণ ও অন্ধকার করে দেওয়া হবে এবং তারা কঠিন আযাব ভোগ করবে।

৪. **কুরআনের দলিল:** * আল্লাহ তা'আলা বলেন: **" النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ"** (সূরা গাফির: ৪৬) (আগুন, যার সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যা উপস্থিত করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে, ফিরআউনের অনুসারীদেরকে কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।) এই আয়াতে কিয়ামতের পূর্বে সকাল-সন্ধ্যা আগুনের সামনে উপস্থিত করার কথা বলা হয়েছে, যা কবরের আযাবের ইঙ্গিত বহন করে।

* আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

" وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ"

(সূরা আত-তাওবাহ: ১০১)

(আর তোমাদের চারপাশে যে বেদুঈনরা আছে, তাদের মধ্যে মুনাফিক রয়েছে এবং মদীনার অধিবাসীদের মধ্যেও; তারা মুনাফিকীতে পাকা। তুমি তাদেরকে জানো না, আমি তাদেরকে জানি। আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব, অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।)

এই আয়াতে 'দু'বার শাস্তি'র একটি ব্যাখ্যা হলো দুনিয়ার শাস্তি এবং কবরের শাস্তি।

৫. **সুন্নাহর দলিল:** * রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে দু'আ করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও তা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ "

'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। (সহীহ বুখারী: ১৩৭৭, সহীহ মুসলিম: ৫৮৮) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই নিয়মিত দু'আ কবরের আযাবের সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ।

* আরও বহু হাদীসে কবরের আযাবের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে, যেমন - কবরে কাফির ও মুনাফিকদেরকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হবে, তাদের কবর সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে এবং তারা সাপ-বিচ্ছুর দংশনে কষ্ট পাবে। পক্ষান্তরে মুমিনদের কবর প্রশস্ত ও আলোকিত হবে এবং তারা শান্তি ও সুখে থাকবে।

অতএব, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো কবরের আযাব এবং নিয়ামত উভয়ই সত্য এবং কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এই বিষয়ে বিশ্বাস রাখা এবং কবরের আযাব থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া ও সৎ আমল করা।

٣. عرف الصحابة ثم بين من هو الأفضل منهم عند أهل السنة.

৩. সাহাবীগণ কারা? এরপর আহলুস সুন্নাহর নিকট তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তা বর্ণনা কর।

সাহাবী (الصحابة) শব্দের অর্থ সঙ্গী। ইসলামী পরিভাষায়, সাহাবীগণ হলেন সেই সম্মানিত মুসলমান, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং ইসলামের উপর অবিচল থেকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন। নারী, পুরুষ, ছোট, বড়, আনসার ও মুহাজির নির্বিশেষে সকলেই এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। সাহাবীদের মর্যাদা ইসলামে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাঁরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং ইসলাম প্রচারের কঠিন পথে তাঁর বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন।

আহলুস সুন্নাহর নিকট সাহাবীদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'তের আকীদা অনুযায়ী, সকল সাহাবীই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং তাঁরা সকলেই ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত। তবে তাঁদের মধ্যে স্তরভেদ বিদ্যমান। মর্যাদার দিক থেকে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম নিম্নরূপ:

১. **খুলাফায়ে রাশেদীন (চার খলীফা):** আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাঃ) সকল সাহাবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এরপর যথাক্রমে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) এবং আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ)-এর স্থান। তাঁদের খিলাফতের ধারাবাহিকতাই তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি।

২. **আশারা মুবাশ্‌শারা (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী):** এই দশজন বিশিষ্ট সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন।

৩. **বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ:** ইসলামের ইতিহাসে এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মর্যাদা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪. **হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ:** এঁদের প্রতিও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ঘোষণা রয়েছে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত সকল সাহাবীকে গভীর ভালোবাসা ও সম্মানের চোখে দেখে এবং তাঁদের কারো প্রতি কোনো প্রকার বিদ্বেষ পোষণ করা হারাম জ্ঞান করে। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠতম প্রজন্ম।

٤. أثبت ختم النبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالدلائل.

৪. দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সমাপ্তি প্রমাণ কর।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সমাপ্তি (খতমে নবুওয়াত) কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

কুরআনের দলিল:

১. **"مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا"** (সূরা আল-আহযাব: ৪০) (মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের শেষ। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত।)

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে "خَاتَمَ النَّبِيِّينَ" (নবীদের শেষ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই নবুওয়তের ধারা সমাপ্ত হয়েছে এবং তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না।

সুন্নাহর দলিল:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বহু হাদীসে তাঁর নবুওয়াতের সমাপ্তির কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: **"إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ، فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ"** (সুনানে তিরমিযী: ২২১৯) (নিশ্চয়ই রিসালাত (প্রেরিত হওয়া) ও নবুওয়াত বন্ধ হয়ে গেছে। আমার পরে আর কোনো রাসূল নেই এবং কোনো নবীও নেই।)

২. অন্য হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন: **"أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي"** (সহীহ মুসলিম: ২৩৫২) (আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী নেই।)

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: **" مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ فَأَنَا لَبِنَةٌ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ"** (সহীহ বুখারী: ৩৫৩৫, সহীহ মুসলিম: ২২৮৬) (আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হলো এমন এক ব্যক্তির মতো যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলো এবং তা খুব সুন্দর ও মনোরম করলো, কেবল এক কোণে একটি ইটের স্থান খালি রাখলো। লোকেরা তা ঘুরে দেখছিল এবং তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছিল এবং বলছিল: এই ইটটি স্থাপন করা হলো না কেন? অতঃপর আমি হলাম সেই ইটটি এবং আমি হলাম নবীদের শেষ।)

এই সুস্পষ্ট আয়াত ও অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। এই বিশ্বাস সকল মুসলিমের জন্য অপরিহার্য এবং এর বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করা কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ।

٥. ما الإيمان بالكتب؟ وكم كتابا سماويا أنزله الله تعالى؟

৫. কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা কী? আল্লাহ তা'আলা কতগুলো আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন?

কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা:

কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা ইসলামী আকীদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এর অর্থ হলো:

১. এই বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে তাঁর রাসূলগণের কাছে বিভিন্ন কিতাব (গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছেন। এই কিতাবসমূহ আল্লাহর বাণী এবং মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য প্রেরিত।

২. এই বিশ্বাস রাখা যে এই সকল কিতাব সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ ও উপদেশাবলী বর্ণনা করেছেন।

৩. ঐ সকল কিতাবের উপর বিস্তারিতভাবে ঈমান আনা, যেগুলোর নাম ও পরিচয় কুরআন ও সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন - তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ও কুরআন।

৪. ঐ সকল কিতাবের উপর সাধারণভাবে ঈমান আনা, যেগুলোর নাম ও সংখ্যা সম্পর্কে আমরা অবগত নই, তবে বিশ্বাস রাখি যে আল্লাহ যুগে যুগে তাঁর রাসূলগণের কাছে কিতাব নাযিল করেছেন।

৫. এই বিশ্বাস রাখা যে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের মূল শিক্ষা সত্য হলেও, সময়ের সাথে সাথে সেগুলোতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতি ঘটেছে।

৬. এই বিশ্বাস রাখা যে কুরআনুল কারীম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। এটি পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সারসংক্ষেপ এবং রহিতকারী। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং এতে কোনো প্রকার পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা নেই। সকল মানবজাতির জন্য এই কিতাবের অনুসরণ করা অপরিহার্য।

আল্লাহ তা'আলা কতগুলো আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন?

কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহ তা'আলা কতগুলো আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন তার নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ নেই। তবে চারটি প্রধান কিতাবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

১. **তাওরাত (التوراة):** এটি আল্লাহ তা'আলা নবী মুসা (আঃ)-এর উপর নাযিল করেছিলেন। এটি বনী ইসরাঈলের পথপ্রদর্শক ছিল।

২. **যাবূর (الزبور):** এটি আল্লাহ তা'আলা নবী দাউদ (আঃ)-এর উপর নাযিল করেছিলেন। এতে বিভিন্ন উপদেশ ও আল্লাহর প্রশংসামূলক স্তুতিগান ছিল।

৩. **ইঞ্জিল (الإنجيل):** এটি আল্লাহ তা'আলা নবী ঈসা (আঃ)-এর উপর নাযিল করেছিলেন। এটি তাওরাতের বিধি-বিধানের সমর্থনকারী এবং কিছু নতুন বিধান সংবলিত ছিল।

৪. **কুরআন (القرآن):** এটি আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন। এটি সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ শরীয়ত এবং পূর্ববর্তী সকল কিতাবের রহিতকারী। কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানবজাতির জন্য এটি অনুসরণীয়।

এছাড়াও কুরআন ও হাদীসে কিছু সহীফার (ছোট পুস্তিকা) উল্লেখ পাওয়া যায়, যা বিভিন্ন নবীর উপর নাযিল হয়েছিল। যেমন - ইবরাহীম (আঃ) ও মুসা (আঃ)-এর সহীফা। তবে আসমানী কিতাবের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। মুসলিমদের কর্তব্য হলো এই বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ যুগে যুগে মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য বহু কিতাব ও সহীফা নাযিল করেছেন, যার মধ্যে এই চারটি প্রধান কিতাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

٦. كم عددا للأنبياء والرسل ؟ وكيف الإيمان بهم؟ بين.

৬. নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা কত? তাঁদের উপর ঈমান আনার পদ্ধতি কী? বর্ণনা কর।

নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা:

কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলীল দ্বারা নবী ও রাসূলগণের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় না। তবে কিছু দুর্বল সূত্রে তাঁদের একটি বিশাল সংখ্যার কথা উল্লেখ আছে। একটি দুর্বল হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নবীদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার এবং রাসূলগণের সংখ্যা তিনশ' পনের জন।"
কুরআনুল কারীমে ২৫ জন নবীর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন: আদম, ইদ্রিস, নূহ, হূদ, সালেহ, ইবরাহীম, লূত, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, ইউসূফ, আইয়ূব, শু'আইব, মূসা, হারূন, যুলকিফল, দাউদ, সুলাইমান, ইলিয়াস, আল-ইয়াসা', ইউনুস, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও মুহাম্মাদ (আলাইহিমুস সালাম)।
আমাদের জন্য এই ২৫ জন নবীর উপর বিশেষভাবে ঈমান আনা এবং সাধারণভাবে বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাদের সংখ্যা একমাত্র তিনিই জানেন।

নবী ও রাসূলগণের উপর ঈমান আনার পদ্ধতি:

নবী ও রাসূলগণের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো:

১. **বিশ্বাস স্থাপন:** এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের পথপ্রদর্শনের জন্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা সকলেই সত্যবাদী, বিশ্বস্ত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত।

২. **তাঁদের রিসালাতের সত্যতা স্বীকার:** তাঁদের আনীত শরীয়ত ও নবুওয়াতের সত্যতা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা। তবে আমাদের উপর বর্তমানে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের অনুসরণ করা ওয়াজিব।

৩. **তাঁদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা:** সকল নবী ও রাসূলকে সম্মান করা এবং তাঁদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা। তাঁদের কারো প্রতি কোনো প্রকার বিদ্বেষ বা অমর্যাদাকর মন্তব্য করা হারাম।

৪. **তাঁদের আনুগত্য:** যে সকল নবী ও রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, তাঁদের আনুগত্য করা। বর্তমানে আমাদের জন্য কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা ফরজ।

৫. **তাঁদের প্রচারিত বাণীর সত্যতা স্বীকার:** তাঁদের প্রচারিত আল্লাহর বাণী ও শিক্ষাসমূহকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। কুরআনে বর্ণিত তাঁদের ঘটনাবলী ও উপদেশসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

৬. **তাঁদের মধ্যে পার্থক্য না করা:** সকল নবী ও রাসূলের উপর ঈমান আনা এবং তাঁদের মধ্যে নবুওয়াতের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য না করা। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে: "আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।" (সূরা আল-বাকারা: ২৮৫)

সংক্ষেপে, নবী ও রাসূলগণের উপর ঈমান আনা হলো তাঁদের আল্লাহর মনোনীত বান্দা ও মানবজাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, তাঁদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা পোষণ করা এবং তাঁদের আনীত শরীয়তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে শেষ নবীর শরীয়তের অনুসরণ করা।

---

٧. ما هي أركان الإيمان الستة؟ اذكرها مع دليل موجز لكل ركن.

৭. ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ কী কী? প্রতিটি স্তম্ভের সংক্ষিপ্ত দলীলসহ উল্লেখ কর।

ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ:

১. আল্লাহর উপর ঈমান (الإيمان بالله): আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করা। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও নিয়ন্ত্রক। তাঁর সুন্দর নামসমূহ ও সুমহান গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা।

দলিল:

"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ"

অনুবাদ: বলুন, তিনি আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। (সূরা আল-ইখলাস: ১-৪)

২. ফেরেশতাদের উপর ঈমান (الإيمان بالملائكة): আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতা নামক এক বিশেষ সৃষ্টিতে বিশ্বাস করা। তাঁরা নূরের তৈরি, আল্লাহর আদেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত এবং আল্লাহর হুকুম পালনে সর্বদা প্রস্তুত।

দলিল:

"آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ"

অনুবাদ: রাসূল বিশ্বাস স্থাপন করেছেন সে বিষয়ের উপর যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনগণও। তাদের প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। তারা আরও বলে, আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। হে আমাদের রব! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন। (সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৫)

৩. কিতাবসমূহের উপর ঈমান (الإيمان بالكتب): আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে তাঁর রাসূলগণের কাছে যে সকল কিতাব নাযিল করেছেন সেগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন - তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ও কুরআন। কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব।

দলিল:

"آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ(আংশিক) ..."

অনুবাদ: রাসূল বিশ্বাস স্থাপন করেছেন সে বিষয়ের উপর যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনগণও। তাদের প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং তাঁর রাসূলগণের উপর... (সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৫)

৪. রাসূলগণের উপর ঈমান (الإيمان بالرسل): আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য রাসূল প্রেরণ করেছেন - এই বিশ্বাস রাখা। তাঁদের মধ্যে প্রথম আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দলিল:

..."وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ(আংশিক) ..."

অনুবাদ: ...এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না... (সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৫)

৫. **আখিরাতের উপর ঈমান (الإيمان باليوم الآخر):** মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

দলিল:

"وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ"

অনুবাদ: এবং তারা আখিরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (সূরা আল-বাকারাহ: ৪)

৬. **তাকদীরের উপর ঈমান (الإيمان بالقدر خيره وشره):** ভালো ও মন্দ যা কিছু ঘটে, সবই আল্লাহর নির্ধারণ ও ইচ্ছানুযায়ী হয় - এই বিশ্বাস রাখা।

দলিল:

"الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ"

অনুবাদ: ঈমান হলো এই যে, তুমি বিশ্বাস রাখবে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, শেষ দিবসের উপর এবং তাকদীরের ভাল ও মন্দের উপর। (ছহীহুল বুখারী হা/৮)

٨ .تحدث عن أهمية التوحيد في الإسلام وبين أنواعه الرئيسية.

৮. ইসলামে তাওহীদের গুরুত্ব আলোচনা করুন এবং এর প্রধান প্রকারভেদগুলো বর্ণনা কর।

তাওহীদের গুরুত্ব:

ইসলামের মৌলিক ভিত্তি হলো তাওহীদ (توحيد), যার অর্থ আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা। এর গুরুত্ব অপরিসীম:

- **ঈমানের মূল:** তাওহীদ হলো শাহাদার মূলকথা – "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ) অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই"। এটি ইসলামের প্রথম স্তম্ভ।
- **সৃষ্টির উদ্দেশ্য:** আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাওহীদ এই ইবাদতকে কেবলমাত্র আল্লাহর দিকেই নির্দেশিত করে। **দলিল:** "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" অনুবাদ: আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সূরা আয-যারিয়াত: ৫১/৫৬)
- **পথনির্দেশনার উৎস:** আল্লাহই একমাত্র পথনির্দেশনার উৎস। কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে তিনি মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন।
- **নৈতিকতার ভিত্তি:** তাওহীদ আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসার মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধের জন্ম দেয়।
- **মানবজাতির ঐক্য:** সকল মানুষ একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি – এই বিশ্বাস মানবজাতির ঐক্য স্থাপন করে।

তাওহীদের প্রকারভেদ:

ইসলামী আলেমগণ তাওহীদকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করেছেন:

১. **তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ (توحيد الربوبية):** আল্লাহর প্রতিপালকত্বের একত্ব। অর্থাৎ আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও এই মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক। **দলিল:** "قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ" অনুবাদ: বলুন, আল্লাহই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, পরাক্রমশালী। (সূরা আর-রা'দ: ১৩/১৬)

২. **তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ (توحيد الألوهية):** আল্লাহর ইবাদতের একত্ব। অর্থাৎ সকল প্রকার ইবাদত – যেমন নামাজ, রোজা, দোয়া, মানত – কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হবে। **দলিল:** " وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ..." অনুবাদ: আর তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না... (সূরা আল-ইসরা: ১৭/২৩)

৩. **তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত (توحيد الأسماء والصفات):** আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর একত্ব। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহর যে সকল নাম ও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোকে কোনো প্রকার বিকৃতি, (অস্বীকার), সাদৃশ্য স্থাপন বা ধরণ নির্ধারণ ব্যতিরেকে বিশ্বাস করা। **দলিল:** " وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" অনুবাদ: আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামের মাধ্যমে ডাক এবং তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা যা করত, তার প্রতিফল অচিরেই পাবে। (সূরা আল-আ'রাফ: ৭/১৮০)

٩. ما المقصود باليوم الآخر؟ وما هي أهم الأحداث التي تقع فيه حسب العقيدة الإسلامية؟

৯. আখিরাত দিবস বলতে কী বোঝায়? ইসলামী আকীদা অনুযায়ী এই দিনে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী কী কী?

- **আখিরাত দিবস**

ঈমান আনা আখিরাত দিবসের উপর, আর তা হলো কিয়ামতের দিন। সেই দিন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্রিত করবেন এবং তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। অতঃপর যে ব্যক্তি মুমিন ও সৎকর্মশীল হবে, আল্লাহ তাকে তাঁর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি কাফির অথবা ফাসিক হবে, আল্লাহ তাকে তাঁর ইনসাফের মাধ্যমে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আর আপনার রব কারো উপর যুলুম করেন না। এবং সেই দিনে থাকবে মীযান (দাঁড়িপাল্লা), যার দ্বারা আমলসমূহ ওজন করা হবে। আর থাকবে সিরাত (পুলসিরাত), যার উপর দিয়ে মানুষ তাদের আমল অনুযায়ী পার হবে। আর থাকবে হাউজে মাওরুদ (প্রশংসিত হাউজ), যা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট। আর থাকবে শাফা'আত (সুপারিশ), যার মাধ্যমে নবীগণ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ মুমিনদের মধ্যে যারা কবীরা গুনাহগার তাদের জন্য সুপারিশ করবেন।"

ইসলামী আকীদা অনুযায়ী এই দিনে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী হলো:

১. শিঙ্গায় ফুঁৎকার (আন-নাফখ): ইস্রাফিল (আঃ) এর শিঙ্গায় দুবার ফুঁৎকার দেবেন। প্রথম ফুঁৎকারে মহাবিশ্বের ধ্বংস হবে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারে সকল মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে।

২. পুনরুত্থান ও সমাবেশ (আল-বা'স ওয়া আল-হাশর): সকল মানুষ কবর থেকে উত্থিত হয়ে হিসাবের জন্য হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে।

৩. আমলনামা পেশ ও হিসাব (عرض الأعمال والحساب): প্রত্যেকের জীবনের কৃতকর্ম তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ থাকবে এবং সেই অনুযায়ী হিসাব নেওয়া হবে।

৪. মীযান (দাঁড়িপাল্লা): মানুষের ভালো ও মন্দ আমল ওজন করার জন্য একটি ন্যায়বিচারের পাল্লা স্থাপন করা হবে।

৫. হাউজে কাউসার: নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে দান করা একটি বিশেষ জলাধার, যেখান থেকে মুমিনগণ পানি পান করবেন।

৬. পুলসিরাত: জাহান্নামের উপর স্থাপিত একটি পিচ্ছিল সেতু, যা পার হয়ে মুমিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

৭. শাফায়াত (সুপারিশ): নবীগণ, ফেরেশতাগণ এবং সৎকর্মশীল বান্দাগণ আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে পাপী মুমিনদের জন্য সুপারিশ করবেন।

৮. জান্নাত ও জাহান্নাম: সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য অনন্ত সুখের স্থান হলো জান্নাত এবং কাফির ও পাপীদের জন্য অনন্ত শাস্তির স্থান হলো জাহান্নাম।

١٠. من هم الملائكة؟ وما هي وظائفهم الأساسية كما ورد في القرآن والسنة؟

১০. ফেরেশতাগণ কারা? কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী তাঁদের প্রধান কার্যাবলী কী কী?

- **ফেরেশতাগণ (الملائكة)**

ফেরেশতাগণ (الملائكة) হলেন আল্লাহর নূরের (আলো) তৈরি এক বিশেষ সৃষ্টি, যারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত। তারা আল্লাহর আদেশে সর্বদা আনুগত্যশীল এবং পানাহার ও নিদ্রা থেকে পবিত্র। কুরআন ও সুন্নাহয় তাদের বিভিন্ন কার্যাবলীর উল্লেখ রয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ফেরেশতাদের প্রধান কার্যাবলী:

১. আল্লাহর ইবাদত ও তাসবীহ পাঠ: ফেরেশতাগণ সর্বদা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করেন এবং তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকেন।

*﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾

অনুবাদ: "তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিন-রাত তাঁর তাসবীহ পাঠ করে, তারা ক্লান্ত হয় না।" (সূরা আল-আম্বিয়া: ২১/২০-২১)

২. **আল্লাহর নির্দেশ পালন:** তারা আল্লাহর সকল আদেশ ও নিষেধ যথাযথভাবে পালন করেন।

*﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

অনুবাদ: "তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না এবং যা আদেশ করা হয়, তাই করে।" (সূরা আত-তাহরীম: ৬৬/৬)

৩. **ওহী বহন:** জিবরাঈল (আঃ) প্রধান ফেরেশতা, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণের কাছে ওহী নিয়ে আসতেন।

*﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾

অনুবাদ: "বিশ্বস্ত রুহ (জিবরাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।" (সূরা আশ-শু'আরা: ২৬/১৯৩-১৯৪)

৪. **আমল লিপিবদ্ধ করা:** কিরমান কাতিবীন নামক ফেরেশতাদ্বয় প্রত্যেক মানুষের ভালো ও মন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করেন।

*﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾

অনুবাদ: "অথচ তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে, সম্মানিত লেখকবৃন্দ, যারা তোমরা যা করো তা লিপিবদ্ধ করে।" (সূরা আল-ইনফিতার: ৮২/১০-১২)

« *إن الملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار (ছহীহুল বুখারী হা/৫৩০) ...»

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ রাত ও দিনে পালাক্রমে তোমাদের কাছে আসেন..." (ছহীহুল বুখারী হা/৫৩০)

৫. **রুহ কবজ করা:** মালাকুল মাউত (মৃত্যুর ফেরেশতা) আল্লাহর আদেশে মানুষের রুহ কবজ করেন।

*﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾

অনুবাদ: "বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন, অতঃপর তোমরা তোমাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আস-সাজদাহ: ৩২/১১)

৬. **জান্নাত ও জাহান্নামের তত্ত্বাবধান:** জান্নাতের তত্ত্বাবধানে রিদওয়ান (আঃ) এবং জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে মালিক (আঃ) নিয়োজিত।

*﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾

অনুবাদ: "আর যারা তাদের রবকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে; যখন তারা সেখানে পৌঁছাবে এবং তার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং তার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা কতই না উত্তম! সুতরাং তোমরা এতে চিরস্থায়ীভাবে প্রবেশ করো।" (সূরা আয-যুমার: ৩৯/৭৩) * ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ﴾ **অনুবাদ:** "এবং তারা চিৎকার করে বলবে, 'হে মালিক! আপনার রব যেন আমাদের মৃত্যু দেন।' তিনি বলবেন, 'তোমরা তো এখানেই থাকবে।" (সূরা আয-যুখরুফ: ৪৩/৭৭)

৭. **মুমিনদের জন্য দু'আ করা:** কিছু ফেরেশতা মুমিনদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত কামনা করে দু'আ করেন।

*﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾

অনুবাদ: "যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের রব! আপনি দয়া ও জ্ঞানে সবকিছু পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন; অতএব যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।" (সূরা আল-মু'মিন: ৪০/৭)

৮. **যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করা:** আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতাগণ বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে মুমিনদের সাহায্য করেছেন।

*﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾

অনুবাদ: "যখন তোমরা তোমাদের রবকে ডেকেছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন (বলে), 'আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আগমন করবে।" (সূরা আল-আনফাল: ৮/৯)

١١ .ما القضاء والقدر؟ وكيف يجب على المسلم أن يؤمن بهما؟

১১. তাকদীর কী? একজন মুসলিমের কিভাবে এর উপর ঈমান আনা উচিত?

তাকদীর (القضاء والقدر) ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অন্যতম স্তম্ভ। তাকদীর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার পূর্বজ্ঞান ও সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ, মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটে, তা সবই আল্লাহ তা'আলার পূর্বনির্ধারিত জ্ঞান ও ইচ্ছানুসারেই ঘটে। কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছের বাইরে সংঘটিত হয় না।

একজন মুসলিমের তাকদীরের উপর যেভাবে ঈমান আনা উচিত তা হলো:

১. **আল্লাহর ইলম (জ্ঞান):** এই বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তা'আলা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখেন। কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। সৃষ্টির পূর্বেও তিনি জানতেন কখন কী ঘটবে, কার রিজিক কতটুকু হবে, কে জান্নাতি হবে আর কে জাহান্নামী হবে।

২. **আল-কিতাব (লিপি):** এই বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির পূর্বেই লাওহে মাহফুজ নামক এক সুরক্ষিত ফলকে সবকিছু লিখে রেখেছেন। মহাবিশ্বের প্রতিটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঘটনা সেই লিপিতে লিপিবদ্ধ আছে।

৩. **আল-মাশি'আ (ইচ্ছা):** এই বিশ্বাস রাখা যে মহাবিশ্বের সবকিছু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না এবং তাঁর অগোচরে কোনো কিছুই ঘটে না।

৪. **আল-খালক (সৃষ্টি):** এই বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তা'আলাই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ যা কিছু ঘটে, সবই আল্লাহর সৃষ্টি। তবে এর অর্থ এই নয় যে আল্লাহ মন্দ কাজের আদেশ দেন বা তাতে সন্তুষ্ট হন, বরং তিনি তাঁর হিকমত ও পরীক্ষার জন্য মন্দ কাজের অনুমতি দেন।

তাকদীরের উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে একজন মুসলিমকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী ভালো বা মন্দ কাজ করতে পারে এবং তার কাজের জন্য সে নিজেই দায়ী থাকবে। তাকদীরকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে নিজের ভুল কাজের দায় এড়ানো উচিত নয়। বরং, তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন মুমিনকে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও আল্লাহর উপর ভরসা

করতে শেখায়। কোনো বিপদ বা মুসিবত এলে মুমিন হতাশ না হয়ে আল্লাহর ফয়সালা হিসেবে মেনে নেয় এবং কল্যাণের আশা রাখে।

সংক্ষেপে, তাকদীরের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো এই বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু তাঁর লিপিতে লিপিবদ্ধ আছে, তাঁর ইচ্ছাতেই সবকিছু ঘটে এবং তিনিই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তবে এর সাথে সাথে মানুষের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও কর্মের জন্য দায়িত্বশীলতার বিশ্বাসও রাখতে হবে।

١٢ .عرف السنة النبوية وبين حجيتها في التشريع الإسلامي.

১২. সুন্নাহর সংজ্ঞা দিন এবং ইসলামী শরীয়তে এর প্রামাণিকতা বর্ণনা কর।

- **সুন্নাহর সংজ্ঞা:**

শাব্দিক অর্থে সুন্নাহ মানে হলো পথ, রীতি, অভ্যাস, বা উদাহরণ। ইসলামী পরিভাষায় সুন্নাহ বলতে মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা (কওল), কাজ (ফেল), এবং মৌন সম্মতি (তাকরীর) কে বোঝায়।

- **কওল (কথা):** রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বীনের বিষয়ে যা কিছু বলেছেন, তা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। যেমন - বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর উপদেশ, ব্যাখ্যা, এবং প্রশ্নের উত্তর।
- **ফেল (কাজ):** রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দৈনন্দিন জীবনে বা ইবাদতের ক্ষেত্রে যা কিছু করেছেন, তা-ও সুন্নাহ হিসেবে গণ্য। যেমন - সালাত আদায়ের পদ্ধতি, হজ্জ পালনের নিয়ম, লেনদেন ও আচার-ব্যবহারের আদর্শ।
- **তাকরীর (মৌন সম্মতি):** রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম কোনো কথা বললে বা কোনো কাজ করলে, যদি তিনি তাতে আপত্তি না করতেন এবং নীরব থাকতেন, তবে সেটিও সুন্নাহ হিসেবে বিবেচিত হয়। এর অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উক্ত কথা বা কাজের অনুমোদন দিয়েছেন।

- **ইসলামী শরীয়তে সুন্নাহর প্রামাণিকতা:**

ইসলামী শরীয়তে সুন্নাহর প্রামাণিকতা কুরআন মাজীদের পরেই দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে স্বীকৃত। কুরআনের অনেক বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং বাস্তবায়ন সুন্নাহর মাধ্যমেই জানা যায়। কুরআনুল কারীমের বহু আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য করার এবং তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা সুন্নাহর প্রামাণিকতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

- **কুরআনের প্রমাণ:**

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

  - **অনুবাদ:** "রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" (সূরা আল-হাশর: ৫৯/৭)

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

- **অনুবাদ:** "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ কর; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আলে-ইমরান: ৩/৩১)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ[1] كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[2]

- **অনুবাদ:** "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিতর্ক কর, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখ। এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।" (সূরা আন-নিসা: ৪/৫৯)

- **হাদীছের প্রমাণ:**
  - রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে, ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না - আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং আমার সুন্নাহ।" (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)
  - অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই সকল কুরআন ও হাদীছের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ইসলামী শরীয়তে সুন্নাহর অপরিহার্যতা ও প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা করে। কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝতে এবং ইসলামী জীবন বিধানকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করতে সুন্নাহর জ্ঞান অপরিহার্য।

١٣ .ما هي أقسام الحديث النبوي من حيث القبول والرد؟ اذكر أمثلة لكل قسم.

১৩. গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতার বিচারে হাদীছের প্রকারভেদগুলো কী কী? প্রতিটি প্রকারের উদাহরণ দিন।

- **গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতার বিচারে হাদীসকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়:**

১. মাকবুল (مقبول): গ্রহণযোগ্য হাদীস। এই প্রকার হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে গণ্য হয় এবং এর উপর আমল করা ওয়াজিব। মাকবুল হাদীসকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন:

সহীহ লি-যাতিহি (صحيح لذاته): যে হাদীছের বর্ণনাকারী প্রত্যেক স্তরে নির্ভরযোগ্য (আদিল ও যাবিত), যার সনদ (বর্ণনাসূত্র) পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় এবং হাদীসটি কোনো প্রকার শায (নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপরীত বর্ণনা) ও ইল্লত (গোপন ত্রুটি) মুক্ত।

উদাহরণ: ইমাম বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীস, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত: এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোজা রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ করা।" (সহীহ বুখারী হা/৮, সহীহ মুসলিম হা/১৬)

সহীহ লি-গাইরিহি (صحيح لغيره): যে হাদীস মূলত হাসান স্তরের, কিন্তু অন্য কোনো সহীহ সনদের মাধ্যমে অথবা একাধিক হাসান সনদের মাধ্যমে শক্তিশালী হওয়ার কারণে সহীহ স্তরে উন্নীত হয়েছে।
উদাহরণ: কোনো হাসান হাদীস যদি অন্য একটি হাসান সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়, যার বর্ণনাকারীগণও নির্ভরযোগ্য, তবে উভয় সনদ মিলে হাদীসটিকে সহীহ লি-গাইরিহি-তে উন্নীত করে।

হাসান লি-যাতিহি (حسن لذاته): যে হাদীছের বর্ণনাকারীগণ আদিল (নির্ভরযোগ্য) তবে তাদের স্মৃতিশক্তি সহীহ হাদীছের বর্ণনাকারীদের তুলনায় কিছুটা দুর্বল, যার সনদ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় এবং হাদীসটি কোনো প্রকার শায ও ইল্লত মুক্ত।
উদাহরণ: এমন কোনো হাদীস যার কোনো বর্ণনাকারী 'সাদূক' (সত্যবাদী) কিন্তু 'যাবিত' (অধিক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন) নন, এবং হাদীসটি শায ও ইল্লত মুক্ত।

হাসান লি-গাইরিহি (حسن لغيره): যে যঈফ হাদীস একাধিক দুর্বল সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ার কারণে শক্তিশালী হয়েছে, তবে দুর্বলতাটি বর্ণনাকারীর মিথ্যাবাদী হওয়ার কারণে অথবা হাদীসটি অত্যাধিক দুর্বল হওয়ার কারণে নয়।
উদাহরণ: এমন একাধিক যঈফ হাদীস যার দুর্বলতা সামান্য, যেমন কোনো বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, কিন্তু হাদীছের মূল বক্তব্য অন্য দুর্বল সূত্রে সমর্থিত।

২. মারদুদ (مردود): অগ্রহণযোগ্য হাদীস। এই প্রকার হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে গণ্য হয় না এবং এর উপর আমল করা জায়েয নয়। মারদুদ হাদীস হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

যঈফ (ضعيف): দুর্বল হাদীস। যে হাদীছের সনদে কোনো দুর্বলতা থাকে, যেমন - বর্ণনাকারীর দুর্বল স্মৃতিশক্তি, বর্ণনাকারীর মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব (ইনকিতা'), অথবা বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকা। যঈফ হাদীছের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে, যেমন - মুরসাল, মুনকাতি', মু'দাল, মু'আল্লাক, শায, মুনকার ইত্যাদি।
উদাহরণ: এমন হাদীস যার সনদে এমন কোনো বর্ণনাকারী রয়েছে যার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল বলে প্রমাণিত অথবা সনদে বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা নেই (যেমন একজন তাবেঈ সরাসরি সাহাবীর কাছ থেকে বর্ণনা না করে অন্য কারো কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন)।

মাওযু' (موضوع): জাল বা বানোয়াট হাদীস। যে হাদীছের মূল বক্তব্য অথবা সনদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে মিথ্যাভাবে প্রচার করা হয়েছে।
উদাহরণ: কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে কোনো কথা বা ঘটনা বানিয়ে বর্ণনা করলে সেটি মাওযু' হাদীস হিসেবে গণ্য হবে।

সুতরাং, গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতার বিচারে হাদীস প্রধানত মাকবুল (সহীহ ও হাসান) এবং মারদুদ (যঈফ ও মাওযু') এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মুহাদ্দিসগণ হাদীছের সনদ ও মতন (মূল বক্তব্য) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই-বাছাই করে এই শ্রেণীবিভাগ নির্ধারণ করেন, যাতে শরীয়তের নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা যায়।

١٤ .تحدث عن نشأة علم أصول الفقه وأهميته في فهم الشريعة الإسلامية.

১৪. উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং ইসলামী শরীয়ত বোঝার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আলোচনা কর।
উত্তর:
উপস্থাপনা: উসূলে ফিকহ (أصول الفقه) শাস্ত্রের উৎপত্তি ইসলামী শরীয়তের ক্রমবিকাশের সাথে গভীরভাবে জড়িত। এর তাৎক্ষণিক কোনো একক সূচনা বিন্দু নেই, বরং এটি ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে।
উৎপত্তি:
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কুরআন ও সুন্নাহই ছিল শরীয়তের প্রধান উৎস। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কোনো মাসআলার সম্মুখীন হলে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতেন।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরামের যুগে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে শুরু করে। তখন তারা কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে ইজতিহাদ (গবেষণা ও নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ) এর মাধ্যমে সমাধান বের করতেন। এই সময়ে কিছু মৌলিক নীতি ও পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যদিও তা কোনো স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে সংকলিত হয়নি। যেমন - কিয়াস (সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ), ইজমা (সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য)।
তাবেঈন ও তৎপরবর্তী ইমামদের যুগে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং নতুন সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে শরীয়তের পরিধি আরও বিস্তৃত হয় এবং জটিল মাসআলার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তখন ফিকহকে সুবিন্যস্ত করার এবং ইজতিহাদের নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই সময়ে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মতো মহান ইমামগণ ফিকহের মূলনীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
বিশেষ করে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কে উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আর-রিসালাহ" (الرسالة) তে শরীয়তের উৎস, ইজতিহাদের পদ্ধতি, এবং বিভিন্ন দলিলের পারস্পরিক

সম্পর্ক ও ব্যবহারের নীতিমালা সু systematভাবে আলোচনা করেন। তাঁর এই গ্রন্থটি উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করে।

এরপর বিভিন্ন যুগে বহু আলেম উসূলে ফিকহের নীতিমালা আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও সংকলন করেন। এর মধ্যে আল-মাওয়ার্দী (রহঃ), আল-জুওয়াইনী (রহঃ), আল-গাযালী (রহঃ), আল-আমীদী (রহঃ), এবং ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)-এর মতো বিদ্বানগণ উল্লেখযোগ্য।

ইসলামী শরীয়ত বোঝার ক্ষেত্রে উসূলে ফিকহের গুরুত্ব:

ইসলামী শরীয়তকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এর প্রধান কারণগুলো হলো:

১. **দলিলের সঠিক উৎস নির্ধারণ:** উসূলে ফিকহ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের মতো শরীয়তের মৌলিক উৎসগুলো চিহ্নিত করে এবং কোন পরিস্থিতিতে কোন উৎসটি প্রাধান্য পাবে তা নির্ধারণের নীতিমালা প্রদান করে।

২. **দলীলের ব্যাখ্যার নীতিমালা:** কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য বোঝা এবং বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য উসূলে ফিকহ অত্যাবশ্যকীয় নীতিমালা সরবরাহ করে। যেমন - আম (সাধারণ) ও খাস (নির্দিষ্ট) অর্থের বিধান, নাসিখ (রহিতকারী) ও মানসূখ (রহিত) আয়াত ও হাদীস চিহ্নিত করার নিয়ম।

3. **ইজতিহাদের পদ্ধতি:** নতুন ও জটিল মাসআলার শরয়ী সমাধান অনুসন্ধানের জন্য উসূলে ফিকহ ইজতিহাদের সঠিক পদ্ধতি ও নীতিমালা নির্ধারণ করে। এর মাধ্যমে যোগ্য আলেমগণ শরীয়তের মূলনীতি অক্ষুণ্ণ রেখে সমসাময়িক সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হন।
4. **ফিকহী মতবিরোধ নিরসন:** উসূলে ফিকহের জ্ঞান ফিকহী মতবিরোধের কারণগুলো বুঝতে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে অথবা শক্তিশালী মতটিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
5. **শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলী অনুধাবন:** উসূলে ফিকহ শরীয়তের মৌল উদ্দেশ্য (مقاصد الشريعة) যেমন - মানুষের কল্যাণ সাধন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, এবং ক্ষতি দূরীকরণ ইত্যাদি অনুধাবন করতে সাহায্য করে, যা ফিকহী মাসআলা জারী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, উসূলে ফিকহ ইসলামী শরীয়তের একটি অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান শাখা। এটি ছাড়া কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা, নতুন মাসআলার শরয়ী সমাধান বের করা এবং শরীয়তের সামগ্রিক কাঠামো অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাই ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান অর্জনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উসূলে ফিকহের জ্ঞান অপরিহার্য।

١٥ .ما هي مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها؟ اذكرها باختصار.

১৫. ইসলামী শরীয়তের ঐকমত্যপূর্ণ উৎসসমূহ কী কী? সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

উত্তর: ইসলামী শরীয়তের ঐকমত্যপূর্ণ উৎসসমূহ চারটি:

১. **আল-কুরআন (القرآن):** এটি আল্লাহর বাণী, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এটি ইসলামী শরীয়তের প্রথম ও প্রধান উৎস। এর প্রতিটি বিধান মুসলিমদের জন্য অবশ্য পালনীয়।

২. **আস-সুন্নাহ (السنة):** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা (কওল), কাজ (ফেল) এবং মৌন সম্মতি (তাকরীর) সুন্নাহ হিসেবে পরিচিত। কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুন্নাহ দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩. **আল-ইজমা' (الإجماع):** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদ (ইসলামী আইনবিদ)-গণের ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা' বলা হয়। এটি শরীয়তের একটি শক্তিশালী দলীল হিসেবে গণ্য হয়।

৪. **আল-কিয়াস (القياس):** কুরআন ও সুন্নাহর কোনো সুস্পষ্ট বিধানের ভিত্তিতে সাদৃশ্যের মাধ্যমে নতুন কোনো মাসআলার শরয়ী সমাধান বের করাকে কিয়াস বলা হয়। তবে কিয়াস কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

এই চারটি উৎস ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি এবং এগুলোর উপর মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ বিদ্বান একমত পোষণ করেন।

١٦ .عرف الإجماع وبين أنواعه وشروطه عند علماء الأصول.

১৬. ইজমা'র সংজ্ঞা দিন এবং উসূলে ফিকহবিদদের নিকট এর প্রকারভেদ ও শর্তাবলী বর্ণনা কর।

- **ইজমা'র সংজ্ঞা:**

উসূলে ফিকহের পরিভাষায় ইজমা' (الإجماع) বলতে বোঝায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর কোনো একটি শরয়ী বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর সকল মুজতাহিদ (ইসলামী আইনবিদ)-গণের ঐকমত্য পোষণ করা। অর্থাৎ, কোনো একটি নির্দিষ্ট মাসআলার হুকুমের ব্যাপারে সকল যুগের সকল যোগ্য ফকীহ (শরীয়ত বিশেষজ্ঞ) একমত হলে তাকে ইজমা' বলা হয়।

- **ইজমা'র প্রকারভেদ:**

উসূলে ফিকহবিদগণ ইজমা'কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

১. ইজমা'-ই কওলী (الإجماع القولي): এই প্রকার ইজমা'তে সকল মুজতাহিদ স্পষ্টভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং একটি নির্দিষ্ট হুকুমের উপর সকলে একমত হন। তাদের এই ঐক্যমত মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রকাশিত হতে পারে। এটি ইজমা'র সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকার হিসেবে বিবেচিত হয়।

২. ইজমা'-ই সুকুতী (الإجماع السكوتي): এই প্রকার ইজমা'তে কোনো একজন বা কয়েকজন মুজতাহিদ একটি শরয়ী বিষয়ে ফতোয়া দেন, এবং অন্যান্য মুজতাহিদগণ তা অবগত হওয়ার পরও কোনো প্রকার বিরোধিতা না করে নীরব থাকেন। বিদ্বানদের মধ্যে এই প্রকার ইজমা'র প্রামাণিকতা নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ উসূলীগণের মতে, যদি দীর্ঘ সময় ধরে কোনো সুস্পষ্ট বিরোধিতা না থাকে এবং বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার সুযোগ পায়, তবে নীরবতা সম্মতি হিসেবে গণ্য হতে পারে।

- **ইজমা'র শর্তাবলী:**
  - **ইজমা' বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য হওয়ার জন্য উসূলে ফিকহবিদগণ কিছু শর্ত আরোপ করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:**

১. সকল মুজতাহিদের ঐক্যমত: যে বিষয়ে ইজমা' অনুষ্ঠিত হবে, সেই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পরবর্তী সকল যুগের সকল যোগ্য মুজতাহিদের একমত হতে হবে। কোনো একজন মুজতাহিদের ভিন্নমত থাকলে তাকে ইজমা' হিসেবে গণ্য করা হবে না।

২. শরয়ী বিষয়ে ঐক্যমত: ইজমা' শুধুমাত্র শরীয়তের বিধানের (হুকম) উপর হতে হবে। জাগতিক বা ঐতিহাসিক বিষয়ে ঐক্যমত শরয়ী ইজমা' হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৩. উম্মতের সকল মুজতাহিদের অন্তর্ভুক্তি: ঐকমত্য পোষণকারী মুজতাহিদগণকে অবশ্যই সেই যুগের উম্মতের সকল অঞ্চলের হতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মুজতাহিদগণের ঐক্যমত সর্বজনীন ইজমা' হিসেবে গণ্য হবে না।

৪. স্পষ্ট মতামত প্রকাশ (ইজমা'-ই কওলীর ক্ষেত্রে): ইজমা'-ই কওলীর ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুজতাহিদকে স্পষ্টভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে হবে। নীরবতা (ইজমা'-ই সুকুতীর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তসাপেক্ষে) স্পষ্ট মতামতের বিকল্প হতে পারে না।

৫. কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী না হওয়া: ইজমা' কখনোই কুরআন ও সুন্নাহর কোনো সুস্পষ্ট বিধানের বিরোধী হতে পারবে না। কারণ ইজমা'র মূল ভিত্তিই হলো কুরআন ও সুন্নাহর উপর।

উসূলে ফিকহের এই নীতিমালা অনুযায়ী, বিশুদ্ধ ইজমা' ইসলামী শরীয়তের একটি অকাট্য ও শক্তিশালী দলীল হিসেবে বিবেচিত হয়, যা কুরআন ও সুন্নাহর পরেই তৃতীয় স্থানে অবস্থান করে।

١٧ .ما القياس؟ وما هي أركانه وشروطه عند جمهور العلماء؟

১৭. কিয়াস কী? সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের নিকট এর স্তম্ভ ও শর্তাবলী কী কী?

উত্তর:

উপস্থাপনা: কিয়াস (القياس) মানে হলো দুটি জিনিসের মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একটির বিধান অন্যটির উপর আরোপ করা। ইসলামী শরীয়তে, কিয়াস হলো কুরআন ও সুন্নাহর পরে শরীয়তের তৃতীয় উৎস। যখন কুরআন ও সুন্নাহতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সুস্পষ্ট বিধান পাওয়া যায় না, তখন কিয়াসের মাধ্যমে সেই বিষয়ের শরয়ী বিধান নির্ধারণ করা হয়।

অধিকাংশ আলেমদের নিকট কিয়াসের স্তম্ভ (أركان القياس):

কিয়াসের মূলত চারটি স্তম্ভ রয়েছে:

১. **আল-আসল (الأصل):** এটি হলো সেই মূল বিষয় বা দৃষ্টান্ত যার সম্পর্কে কুরআন বা সুন্নাহতে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে এবং যার ভিত্তিতে নতুন বিষয়ের বিধান নির্ধারণ করা হবে। একে "মাকিস আলাইহি" (المقيس عليه) বা যার সাথে তুলনা করা হয়, তাও বলা হয়।

২. **আল-ফার'উ (الفرع):** এটি হলো সেই নতুন বিষয় যার সম্পর্কে কুরআন বা সুন্নাহতে সুস্পষ্ট বিধান নেই এবং কিয়াসের মাধ্যমে যার বিধান নির্ধারণ করা হবে। একে "মাকিস" (المقيس) বা যা তুলনা করা হয়, তাও বলা হয়।

৩. **আল-'ইল্লাহ (العلة):** এটি হলো সেই অভিন্ন কারণ বা বৈশিষ্ট্য যা আসল (আল-আসল) ও নতুন বিষয় (আল-ফার'উ) উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং যার ভিত্তিতে উভয়ের বিধান একই হবে। এই 'ইল্লাহ শরীয়তের মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়।

৪. **হুকম আল-আসল (حكم الأصل):** এটি হলো সেই শরয়ী বিধান যা মূল বিষয় (আল-আসল) সম্পর্কে কুরআন বা সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে এবং যা কিয়াসের মাধ্যমে নতুন বিষয়ের উপর আরোপ করা হবে।

অধিকাংশ আলেমদের নিকট কিয়াসের শর্তাবলী (شروط القياس):

কিয়াস শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্তাবলী রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. **আল-আসলের হুকম শরয়ী হতে হবে:** অর্থাৎ, মূল বিষয়ের বিধানটি শরীয়তের কোনো দলীল (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা) দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে।

২. **আল-আসলের 'ইল্লাহ সুস্পষ্ট ও সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে:** 'ইল্লাহ এমন সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হতে হবে যা সহজেই অনুধাবন করা যায় এবং শরীয়তের অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

৩. **আল-ফার'উতে সেই 'ইল্লাহ বিদ্যমান থাকতে হবে:** নতুন বিষয়ে অবশ্যই সেই একই কারণ বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকতে হবে যার ভিত্তিতে মূল বিষয়ের বিধান আরোপিত হচ্ছে।

৪. **আল-আসলের হুকম খাছ (নির্দিষ্ট) না হওয়া:** যদি মূল বিষয়ের বিধানটি কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপট, ব্যক্তি বা সময়ের জন্য খাছ হয়, তবে তা সাধারণভাবে অন্য বিষয়ের উপর কিয়াস করা যাবে না।

৫. **কিয়াস কুরআন ও সুন্নাহর কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরোধী না হওয়া:** কিয়াসের মাধ্যমে এমন কোনো বিধান নির্ধারণ করা যাবে না যা কুরআন বা সুন্নাহর কোনো স্পষ্ট আদেশের সাথে সাংঘর্ষিক।

৬. **'ইল্লাহ মুতা'আদ্দি (متعدي) হতে হবে:** অর্থাৎ, 'ইল্লাহ এমন হতে হবে যা মূল বিষয় থেকে নতুন বিষয়ের দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে। যদি 'ইল্লাহ কেবল মূল বিষয়ের সাথেই নির্দিষ্ট থাকে, তবে তার ভিত্তিতে কিয়াস শুদ্ধ হবে না।

এই স্তম্ভ ও শর্তাবলী পূরণ হলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের নিকট কিয়াস একটি গ্রহণযোগ্য শরয়ী দলীল হিসেবে বিবেচিত হয়।

١٨ .تحدث عن مفهوم البدعة في الإسلام وبين أنواعها وحكمها.

১৮. ইসলামে বিদ'আতের ধারণা আলোচনা করুন এবং এর প্রকারভেদ ও হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর:

উপস্থাপনা: ইসলামে বিদ'আতের ধারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা শরীয়তের বিশুদ্ধ জ্ঞান ও আমলের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। শাব্দিক অর্থে বিদ'আত (البدعة) মানে হলো নতুন কিছু উদ্ভাবন করা, যা পূর্বে বিদ্যমান ছিল

না। তবে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলতে দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু উদ্ভাবন করাকে বোঝায়, যার কোনো ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহতে নেই এবং যা ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য হয়।

ইসলামে বিদ'আতের প্রকারভেদ:

বিদ'আতকে মূলত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়:

১. **বিদ'আতে কাওলীয়া (بدعة قولية):** এই প্রকার বিদ'আত কথার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যেমন - কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোনো আকীদা বা বিশ্বাস পোষণ করা অথবা এমন কোনো কথা বলা যা শরীয়তে অনুমোদিত নয় এবং দ্বীনের অংশ হিসেবে প্রচার করা হয়।

২. **বিদ'আতে আমালিয়া (بدعة عملية):** এই প্রকার বিদ'আত কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যেমন - শরীয়তে নতুন কোনো ইবাদতের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা অথবা শরীয়তে বিদ্যমান কোনো ইবাদতের পদ্ধতিতে এমন কিছু যোগ করা বা বাদ দেওয়া যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং যা দ্বীনের অংশ হিসেবে পালন করা হয়। বিদ'আতে আমালিয়াকে আরও দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

বিদ'আতে মুরাক্কাবা (بدعة مركبة): শরীয়তে বিদ্যমান দুটি ইবাদতকে একত্রিত করে নতুন কোনো ইবাদতের পদ্ধতি তৈরি করা, যার কোনো ভিত্তি শরীয়তে নেই।

বিদ'আতে মুফাররাদা (بدعة مفردة): শরীয়তে নতুন কোনো ইবাদত উদ্ভাবন করা, যার কোনো প্রমাণ কুরআন ও সুন্নাহতে পাওয়া যায় না।

ইসলামে বিদ'আতের হুকুম:

ইসলামে বিদ'আত সম্পূর্ণরূপে **হারাম (অবৈধ)** এবং **মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত)**। এর স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহয় বহু কঠোর সতর্কবাণী এসেছে।

- **কুরআনের দলীল:**
  - ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾
    - **অনুবাদ:** "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদাহ: ৫/৩) এই আয়াত স্পষ্ট করে যে দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, সুতরাং নতুন করে কিছু যোগ করার কোনো অবকাশ নেই।
- **হাদীছের দলীল:**
  - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (ছহীহুল বুখারী হা/২৬৯৭, ছহীহ মুসলিম হা/১৭১৮)

- **অনুবাদ:** "যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন উদ্ভাবন করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" (ছহীহুল বুখারী হা/২৬৯৭, ছহীহ মুসলিম হা/১৭১৮)
- অন্য হাদীসে তিনি বলেন, « وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» (সুনানে আবু দাউদ হা/৪৬০৭, সুনানে তিরমিযী হা/২৬৭৬)
- **অনুবাদ:** "তোমরা নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ থেকে সাবধান থাকো, কারণ প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয় বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।" (সুনানে আবু দাউদ হা/৪৬০৭, সুনানে তিরমিযী হা/২৬৭৬)

তবে, জাগতিক বিষয়ে নতুন কোনো উপকারী উদ্ভাবন করা, যা শরীয়তের মৌলিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং যা ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য হয় না, তা বিদ'আত হিসেবে বিবেচিত হবে না। যেমন - নতুন প্রযুক্তি, যানবাহন, বা চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন।

সুতরাং, দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা, যার কোনো শরয়ী ভিত্তি নেই এবং যা ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য হয়, তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য এবং হারাম। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করে বিদ'আত থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

١٩ .ما هي مقاصد الشريعة الإسلامية؟ اذكر أهميتها و أقسامها.

১৯. ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ কী কী? এর গুরুত্ব ও প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

উত্তর:

উপস্থাপনা: ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ (مقاصد الشريعة الإسلامية) হলো সেইসব অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ও লক্ষ্য যা আল্লাহ তা'আলা শরীয়তের বিধান জারীর মাধ্যমে অর্জন করতে চান। এটি ইসলামী jurisprudence-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যা শরীয়তের হিকমত ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে সাহায্য করে।

ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহের গুরুত্ব:

ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহ অনুধাবন করার গুরুত্ব অপরিসীম। এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো:

- **বিধানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি:** শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলী জানার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি প্রতিটি বিধানের ভেতরের হিকমত ও কল্যাণ বুঝতে সক্ষম হয়।
- **যুক্তিযুক্ত ইজতিহাদ:** মুজতাহিদগণ (ইসলামী আইনবিদ) নতুন মাসআলার সমাধানে এবং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে শরীয়তের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন।
- **শরীয়তের সামগ্রিক জ্ঞান:** শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন শরীয়তের বিভিন্ন বিধানের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ করতে সহায়ক।
- **ইসলামের সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞা অনুধাবন:** শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলী মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করার পাশাপাশি ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত করে, যা ইসলামের সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞাকে ফুটিয়ে তোলে।

- **মুসলিম উম্মাহর ঐক্য:** শরীয়তের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহের উপর ঐক্যমত পোষণ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখতে সহায়ক।

ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহের প্রকারভেদ:

শরীয়তের উদ্দেশ্যসমূহকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। তবে সাধারণভাবে এর প্রধান প্রকারভেদগুলো হলো:

* **ضروريات (জরুরিয়্যাত) বা অপরিহার্য উদ্দেশ্য:** এই উদ্দেশ্যগুলো মানুষের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং এগুলো ব্যতিরেকে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এগুলোকে "পাঁচটি মৌলিক বিষয়" (الكليات الخمس) হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়:

* **حفظ الدين (দ্বীন রক্ষা):** ইসলামী বিশ্বাস, ইবাদত ও শরীয়তের মৌলিক নীতিসমূহ রক্ষা করা। যেমন - সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্বের বিধান, জিহাদের বিধান ইত্যাদি।

* **حفظ النفس (জীবন রক্ষা):** মানুষের জীবন রক্ষা করা এবং জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যেমন - হত্যা ও আত্মহত্যা হারাম করা, জীবন রক্ষাকারী বিধান জারী করা ইত্যাদি।

* **حفظ العقل (বুদ্ধি রক্ষা):** মানুষের বিবেক ও বুদ্ধিকে রক্ষা করা এবং জ্ঞান অর্জনকে উৎসাহিত করা। যেমন - মাদকদ্রব্য ও নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য হারাম করা, জ্ঞান চর্চার প্রতি উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি।

* **حفظ النسل (বংশ রক্ষা):** মানব বংশধারাকে রক্ষা করা এবং পরিবার ব্যবস্থাকে সুসংহত করা। যেমন - বিবাহের বিধান, ব্যভিচার হারাম করা, সন্তানের লালন-পালনের নির্দেশ ইত্যাদি।

* **حفظ المال (সম্পদ রক্ষা):** মানুষের বৈধ সম্পদ রক্ষা করা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করা। যেমন - চুরি, ডাকাতি, সুদ ও আত্মসাৎ হারাম করা, হালাল উপার্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি।

* **حاجيات (হাজিয়্যাত) বা প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য:** এই উদ্দেশ্যগুলো মানুষের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন না হলেও জীবনকে সহজ ও স্বাভাবিক করার জন্য জরুরি। এগুলো অনুপস্থিত হলে মানুষ সংকীর্ণতা ও কষ্টের সম্মুখীন হয়, তবে জীবনের মূল ভিত্তি টিকে থাকে। যেমন - ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, বিবাহ ও তালাকের বিস্তারিত বিধিবিধান ইত্যাদি।

* **تحسينيات (তাহসিনিয়্যাত) বা সৌন্দর্যবর্ধক উদ্দেশ্য:** এই উদ্দেশ্যগুলো মানুষের জীবনকে আরও সুন্দর, মার্জিত ও রুচিশীল করে তোলে। এগুলো অপরিহার্য বা জরুরি না হলেও উত্তম জীবন যাপনের জন্য সহায়ক। যেমন - পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শালীন পোশাক পরিধান, উত্তম আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি।

এই প্রকারভেদগুলো ইসলামী শরীয়তের বিধানাবলীকে বুঝতে এবং এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে। একজন বিজ্ঞ আলেম এই উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখেই কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নতুন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করেন।

٢٠ .بين أهمية الأخلاق في الإسلام وما هي بعض الفضائل الأخلاقية التي حث عليها الإسلام؟

২০. ইসলামে আখলাকের গুরুত্ব বর্ণনা করুন এবং ইসলাম যেসব নৈতিক গুণাবলী অর্জনের জন্য উৎসাহিত করেছে তার কয়েকটি উল্লেখ কর।

উত্তর:

উপস্থাপনা: ইসলামে আখলাকের (নৈতিকতা) গুরুত্ব অপরিসীম। আখলাক হলো ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ এবং এটি ঈমানের পূর্ণতার অপরিহার্য অংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর রিসালাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» (মুসনাদে আহমাদ হা/৮৯৩৯)। অর্থাৎ, "আমাকে তো কেবল উন্নত চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে।" এই হাদীস থেকেই বোঝা যায়, ইসলামে আখলাকের স্থান কত উচ্চে।

ইসলাম কেবল কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও ইবাদতের সমষ্টি নয়, বরং এটি জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়। একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আখলাকের প্রতিফলন ঘটা অপরিহার্য। উত্তম আখলাক মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে এবং সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।

- **ইসলামে আখলাকের গুরুত্ব**

কুরআন ও হাদীছের দলীল সহ ইসলামে আখলাকের গুরুত্ব অপরিসীম।

কুরআনের দলীল:

১. আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের প্রশংসা করে বলেন:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

অনুবাদ: "আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" (সূরা আল-কালাম: ৬৮/৪)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উত্তম চরিত্র স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এটি আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

২. অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

অনুবাদ: "যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আল-আহযাব: ৩৩/২১)

এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকে মুসলিমদের জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যার মধ্যে তাঁর উন্নত চরিত্রও অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছের দলীল:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

অনুবাদ: "আমাকে তো কেবল উন্নত চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে।" (মুসনাদে আহমাদ: ৮৯৩৯, মুয়াৎত্তা মালিক: ১৬১৪)

এই হাদীস আখলাকের গুরুত্বের উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মিশনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষের চরিত্রকে উন্নত করা।

২. তিনি আরও বলেছেন:

»أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا«

অনুবাদ: "মুমিনদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানের অধিকারী যে চরিত্রে উত্তম।" (সুনানে তিরমিযী: ২৬১৬, সুনানে আবু দাউদ: ৪৬৮২)

এই হাদীস ঈমানের সাথে উত্তম চরিত্রের গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে। যার চরিত্র যত সুন্দর, তার ঈমান তত পূর্ণ।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

»مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ«

অনুবাদ: "কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী আর কিছুই হবে না।" (সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৯৯, সুনানে তিরমিযী: ২০০২)

এই হাদীস আখলাকের গুরুত্ব ও প্রতিদান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়। কিয়ামতের দিন উত্তম চরিত্র মুমিনের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান হবে।

৪. তিনি আরও বলেন:

»إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ«

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই মুমিন তার উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে রোজা পালনকারী ও রাতে ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভ করে।" (সুনানে আবু দাউদ: ৪৮০০)

এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, উত্তম চরিত্র নফল ইবাদতের সমতুল্য মর্যাদা এনে দিতে পারে।

এই কুরআন ও হাদীছের দলীলগুলো ইসলামে আখলাকের অপরিসীম গুরুত্ব প্রমাণ করে। একজন মুসলিমের উচিত তার চরিত্রকে উত্তমরূপে গঠন করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা।

- **ইসলাম যেসব নৈতিক গুণাবলী অর্জনের জন্য উৎসাহিত করেছে তার কয়েকটি:**

ইসলাম অসংখ্য নৈতিক গুণাবলী অর্জনের জন্য উৎসাহিত করেছে। তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. সততা ও সত্যবাদিতা (الصدق): ইসলামে সততা ও সত্যবাদিতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একজন মুসলিমের কথা ও কাজে সত্যবাদী হওয়া এবং সকল প্রকার মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾(সূরা আত-তাওবাহ, ৯:১১৯)। অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।"

২. **ন্যায়বিচার (العدل):** ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। মুসলিমদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ন্যায়নীতি অনুসরণ করতে এবং কারো প্রতি কোনো প্রকার অবিচার না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (সূরা আন-নাহল, ১৬:৯০)। অর্থাৎ, "নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"

৩. **ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা (الصبر):** জীবনে দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা এবং অন্যের ভুল ও ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। কুরআনে ধৈর্যশীলদের জন্য মহান প্রতিদানের ঘোষণা রয়েছে।

৪. **বিনয় ও নম্রতা (التواضع):** অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহার করে বিনয়ী ও নম্র হওয়া মুমিনের অন্যতম গুণ। আল্লাহ তা'আলা বিনয়ীদের ভালোবাসেন।

৫. **দানশীলতা (الكرم والجود):** নিজের সাধ্য অনুযায়ী অভাবী ও দরিদ্রদের সাহায্য করা এবং অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

৬. **ক্ষমা (العفو):** অন্যের ভুল ও অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া এবং প্রতিশোধের স্পৃহা দমন করা উত্তম আখলাকের পরিচায়ক।

৭. **বিশ্বাসযোগ্যতা ও আমানতদারী (الأمانة):** অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা এবং অন্যের সম্পদ ও গোপন কথা রক্ষা করা মুসলিমের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

৮. **সদাচরণ (الإحسان):** কেবল মুসলিমদের সাথেই নয়, বরং সকল মানুষের সাথে এবং এমনকি জীবজন্তুর সাথেও উত্তম আচরণ করা ইসলামের শিক্ষা।

৯. **পরোপকার (الإيثار):** নিজের প্রয়োজনের উপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া একটি মহৎ গুণ, যা ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে।

১০. **সময়ানুবর্তিতা (المحافظة على الوقت):** সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং সময়ের সঠিক ব্যবহার করা ইসলামের শিক্ষা।

এছাড়াও আরও অসংখ্য নৈতিক গুণাবলী রয়েছে যা ইসলামে অর্জনের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, উত্তম আখলাক একজন মুসলিমের ঈমানের সৌন্দর্য এবং ইসলামী সমাজের ভিত্তি।

কামিল (স্নাতকোত্তর তাফসীর প্রথম পর্ব পরীক্ষা-২০২৩

মডেল প্রশ্নপত্র

العقيدة الإسلامية (আল- আকিদাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ্)

الورقة الثامنة (৮ম পত্র)

বিষয় কোড: ৬২১১০৮

সময়: ৪ ঘন্টা **পূর্ণমান :১০০**

الملاحظة: أجب عن ثمانية من مجموعة (الف) وعن أربعة من مجموعة (ب)

(দ্রষ্টব্য: (ক) অংশ হতে আটটি (খ) অংশ হতে চারটি প্রশেনর উত্তর দাও)

(أ) مجموعة : الأسئلة المفصلة-80

١- أجب عن ثمانية من الأسئلة التالية

(নিচের যে কোন আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

أ. عرف التوحيد ثم اذكر أركانه، هل صفة الله تعالى الذاتية والفعلية قديمة؟ بين

তাওহীদের সংজ্ঞা দিন, অতঃপর এর রোকনগুলো (স্তম্ভ) উল্লেখ কর। আল্লাহর যাতী (সত্তা বিষয়ক) ও ফে'লী (কর্ম বিষয়ক) সিফাত কি কাদীম (অনাদি)? বর্ণনা কর।

ب. هل يجوز إطلاق لفظ "الشيء" و " النفس" و" النور" و"اليد والقدم" على الله تعالى؟ بين مذهب أهل السنة مع الرد على المبتدعين.

আল্লাহর উপর "আল-শাই" (বস্তু), "আন-নাফস" (সত্তা), "আন-নূর" (আলো), "আল-ইয়াদ" (হাত) ও "আল-কদাম" (পা) শব্দগুলোর ব্যবহার কি জায়েজ? আহলুস সুন্নাহর মাযহাব বর্ণনা করুন এবং বিদ'আতীদের খণ্ডন কর।

ج. مر ما معنى الاستواء؟ أوضح رأى أهل السنة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى.

"ইস্তিওয়া" শব্দের অর্থ কী? আল্লাহর বাণী "আর-রাহমানু আলাল আরশিস্তাওয়া" (দয়াময় আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন) - এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মতামত স্পষ্ট কর।

د. من يمكن رؤية الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة؟ بين مذهب أهل السنة مدللا في هذه المسئلة بالوضاحة.

দুনিয়া ও আখিরাতে কারা আল্লাহকে দেখতে পাবে? এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মাযহাব স্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

هـ. هل القرآن كلام الله غير مخلوق؟ بين عقيدة أهل السنة في هذه المسئلة.

কুরআন কি আল্লাহর কালাম (কথা), যা মাখলুক (সৃষ্ট) নয়? এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকীদা বর্ণনা কর।

ح. هل أفعال العباد مخلوقة الله؟ بين المسئلة مع الرد على مخالفي أهل السنة.

বান্দাদের কর্ম কি আল্লাহর সৃষ্টি? এ বিষয়টি বর্ণনা করুন এবং আহলুস সুন্নাহর বিরোধীদের খণ্ডন কর।

و. الإيمان وهل هو يزيد وينقص بين المسئلة مع ذكر أقوال العلماء الصالة

ঈমান কি বাড়ে ও কমে? এ বিষয়টি বর্ণনা করুন এবং সৎকর্মশীল আলেমদের মতামত উল্লেখ কর।

ز. بين حكم مرتكب الكبيرة بضوء مذاهب العلماء مع ترجيح رأي أهل السنة.

কবিরা গুনাহকারী ব্যক্তির হুকুম আলেমদের বিভিন্ন মাযহাবের আলোকে বর্ণনা করুন এবং আহলুস সুন্নাহর মতের প্রাধান্য দিন।

ح. من هم المخاطبون بالإيمان؟ بين حكم قراري المشركين في الآخرة مفصلا.

ঈমানেরمخاطب (যাদের প্রতি ঈমানের আহ্বান) কারা? আখিরাতে মুশরিকদের পরিণতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

ط. هل كرامة الأولياء حق؟ بين أدلة ثبوت الكرامة من القرآن والسنة ؟

আওলিয়াদের কারামত কি সত্য? কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কারামত প্রমাণের দলিল বর্ণনা কর।

ي. عرف الإسراء والمعراج؟ هل المعراج كان في المنام أم في اليقظة مع الروح والجسدة بين رأي أهل السنة مدللا

ইসরা ও মি'রাজের সংজ্ঞা দিন। মি'রাজ কি স্বপ্নে হয়েছিল নাকি জাগ্রত অবস্থায় রুহ ও দেহ উভয়সহ? দলিলের মাধ্যমে আহলুস সুন্নাহর মতামত বর্ণনা কর।

ك. لى هل الجنة والنار مخلوقتان الآن وهل هما تغنيان أم تبيدان بين مدلل

জান্নাত ও জাহান্নাম কি বর্তমানে সৃষ্ট? এবং এ দুটি কি শেষ হয়ে যাবে নাকি চিরস্থায়ী থাকবে? দলিলের মাধ্যমে বর্ণনা কর।

(ب) مجموعة : الأسئلة الموجزة-٢٠

(খ. অংশ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-২০)

أجب عن أربعة من الأسئلة التالية-

(নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও যে কোন দশটি)

١. هل الشفاعة حق لمرتكب الكبيرة من المسلمين؟ بين مدللا.

১. মুসলিমদের মধ্যে যে বড় পাপ করেছে, তার জন্য কি সুপারিশের অধিকার আছে? দলীলসহ বর্ণনা করুন।

٢. هل عذاب القبر حق؟ بين عقيدة أهل السنة في المسئلة.

২. কবরের আযাব কি সত্য? এই বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর আকীদা বর্ণনা করুন।

٣. عرف الصحابة ثم بين من هو الأفضل منهم عند أهل السنة.

৩. সাহাবীগণ কারা? এরপর আহলুস সুন্নাহর নিকট তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তা বর্ণনা করুন।

٤. أثبت ختم النبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالدلائل.

৪. দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সমাপ্তি প্রমাণ করুন।

٥. ما الإيمان بالكتب؟ وكم كتابا سماويا أنزله الله تعالى؟

৫. কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা কী? আল্লাহ তা'আলা কতগুলো আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন?

٦. كم عددا للأنبياء والرسل ؟ وكيف الإيمان بهم؟ بين.

৬. নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা কত? তাঁদের উপর ঈমান আনার পদ্ধতি কী? বর্ণনা করুন।